দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ৮ এপ্রিল, ২০২৪।। ২৫ চৈত্র, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

## গ্রীষ্মের দাবদাহ, সঙ্গে জলসংকট

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৮ এপ্রিল - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ☐ ৫

**২০২৪ ও ২০২৬ দুটিই পাখির চোখ** ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

**রেখায় বলিরেখা দিদি কপালে!** ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

**ভারতীয় যুবসমাজ ও ভারতের দেব-দেবী** ☐ দীপঙ্কর গুপ্ত ☐ ৮

**সোমালিয়ার জলদস্যুদের বিরুদ্ধে বড়ো সাফল্য : পাকিস্তানিদের কণ্ঠে 'ভারত জিন্দাবাদ' স্লোগান** ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

**ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালী ও পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া** ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১১

**মা-মাটি-মানুষের রাজ্যে শুধুই ধ্বংসলীলা আর মানুষের হাহাকার** ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ১৪

**উদ্বাস্তু ভাবাবেগে ভর করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল** ☐ ড. রুবি সাঁই ☐ ১৬

**মাতৃভূমি, মাতৃশক্তি, মাতৃচেতনা** ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ১৮

**বাংলা সাহিত্যে গ্রীষ্মকালীন ঝড়** ☐ শাওন ব্যানার্জী ☐ ২৩

**গরমকালে নিয়ম মেনে খাদ্য গ্রহণ করলে খুব সহজেই নীরোগ থাকা যায়** ☐ দিতি ভট্টাচার্য ☐ ২৪

**জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদ অনুসন্ধানেই জল সমস্যার সমাধান** ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৫

**গরমে সুস্থ থাকতে প্রচুর জল আর মরসুমি ফল খান** ☐ ডাঃ দেবাশিস পাহাড়ি ☐ ২৬

**পশ্চিমবঙ্গের জল সম্পদ বর্তমান পরিস্থিতি** ☐ অনিকেত বৈশ্য ☐ ২৭

**ওঁ বা ওঙ্কার ঈশ্বরের সমস্ত নামের প্রতিনিধিস্বরূপ** ☐ কানুরঞ্জন দেবনাথ ☐ ৩১

**বর্ষপ্রতিপদ ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার** ☐ সরোজ চক্রবর্তী ☐ ৩৪

**গ্রীষ্মের মরসুমে ব্রত ও আলপনা বঙ্গের শিকড় সংস্কৃতি** ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩৫

**উৎসবের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত জীবন পদ্ধতিকে প্রচারিত করে হিন্দু নববর্ষ** ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ৩৬

**হিন্দু নববর্ষ যুগাব্দ শুরু হয় চৈত্র মাসেই** ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ৩৮

**গ্রীষ্মের চাষাবাদ** ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৪৩

**বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক, কীসের ইঙ্গিত?** ☐ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৪৫

**বন্ড রাজনীতির নেপথ্যে বিরোধীদের অন্য খেলা রয়েছে** ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ৪৭

**নিয়মিত বিভাগ :**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ☐ খেলা : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০**

প্রকাশিত হবে ১৫ এপ্রিল, ২০২৪

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৫ এপ্রিল, ২০২৪

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন রাষ্ট্র। হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব। এই দেশের হাজার হাজার বছরের রাষ্ট্রজীবন এই কথাই প্রমাণ করে। স্বস্তিকার বাংলা নববর্ষ (১৪৩১) বিশেষ সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন তথাগত রায়, অভিমন্যু গুহ, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, তিলক সেনগুপ্ত, প্রবীর ভট্টাচার্য, রবিরঞ্জন সেন প্রমুখ।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**
Branch : **Sreemani Market**
**Kolkata-700 006**

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## জলসংকট না সভ্যতার সংকট

ঋতুচক্রের আবর্তনে গ্রীষ্ম আসিতে এখনো সপ্তাহখানেক বিলম্ব থাকিলেও তাহার তীব্রতা চোখ রাঙাইতে শুরু করিয়াছে। আবহাওয়া-বিদরা বলিতেছেন, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর তাপমাত্রা অধিক তীব্র হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবে নাজেহাল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও অগ্রিম সতর্কতা অবলম্বনে চিকিৎসকের পরামর্শে সুষ্ঠু জীবনযাপন করা যায়। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ তাহা করিয়াও থাকেন। গ্রীষ্মকালে সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ বিষয় হইল, এই সময় জলসংকট তীব্র আকার ধারণ করিয়া থাকে। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই দুর্ভোগের শিকার হন অধিক পরিমাণে। বিগত কয়েক বৎসর হইতে শহরাঞ্চলের মানুষদিগকেও এই দুর্ভোগের মধ্যে পড়িতে হইতেছে। নীতি আয়োগের এক সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই দিল্লি, চেন্নাই, হায়দরাবাদ-সহ ভারতের একুশটি শহর জলশূন্য হইবার আশঙ্কায় রহিয়াছে। বিগত দুই বৎসর যাবৎ চেন্নাই শহরে রীতিমতো জলসংকট চলিতেছে। দেশের অন্যান্য রাজ্য হইতে সেইখানে ট্যাঙ্কারে জল পাঠাইতে হইতেছে। তবু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই বৎসর শীতের শেষ হইতেই ব্যাঙ্গালুরু শহরে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়াছে। জলের জন্য সেখানে হাহাকার চলিতেছে। পানীয় জলের সহিত সেখানে গৃহস্থালীর কাজকর্ম এমনকী শৌচকর্মের জন্য জলও ক্রয় করিতে হইতেছে। ব্যাঙ্গালুরু-সহ দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, লখনউ, জয়পুর ও ভাতিণ্ডায়ও জলসংকট শুরু হইয়াছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, পূর্ণমাত্রায় গ্রীষ্ম শুরু না হইতেই যেইভাবে দাবদাহ ও জলসংকট দেখা দিয়াছে তাহা খুবই বিপদের ইঙ্গিত দিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় হইল, এত সতর্কতা সত্ত্বেও সমাজ এখনো সচেতন হইতেছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার জানাইতেছে, সমগ্র বিশ্বের স্বাদু জলের মাত্র চার শতাংশ ভারতের নিকট রহিয়াছে। পরিমিত ব্যবহার ও অপচয় রোধ করিতে না পারিলে আফ্রিকার কেপটাউন শহরের ন্যায় অবস্থা ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে হইতে পারে। কেপটাউন শহরকে ইদানীং জলশূন্য শহর ঘোষণা করা হইয়াছে। অচিরেই এই শহর পরিত্যক্ত শহরে রূপান্তরিত হইবে। পরিবেশবিদদের মতে ভারতে জলসংকটের প্রধান কয়েকটি কারণ হইল বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের হ্রাস, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামিয়া যাওয়া, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস এবং ব্যাপক হারে জলের অপচয়। ভারতের পঞ্চাশ শতাংশ জমি কৃষিযোগ্য এবং তাহার অধিকাংশই ভূগর্ভস্থ জলের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। শহরাঞ্চলে এবং আজকাল গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক কংক্রিটের ব্যবহারের ফলে বৃষ্টিপাতের জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বৃষ্টিপাতের সমস্ত জলই বহিয়া যাইতেছে। আবার কৃষিকার্যে ব্যাপক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে ভূগর্ভস্থ জল বিষাক্ত হইয়া পড়িতেছে। সমগ্র দেশে যে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তাহারও সত্তর শতাংশ ভূগর্ভ হইতেই উত্তোলিত হয়। ইহার ফলেই ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারে টান পড়িয়াছে। ভারতে ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার গ্রামে ১৯ কোটি ১৯ লক্ষ পরিবারের বাস। একটি সমীক্ষায় জানা যাইতেছে, এখনো বহু কোটি মানুষের জন্য বিশুদ্ধ জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই। অপরিশ্রুত জল পান করিয়া বহু মানুষ আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড জনিত রোগের কবলে পড়িতেছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে তীব্র জলসংকট হইতে দূরে থাকিলেও রাজ্যের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুরের কিয়দংশ এলাকার মানুষ একশত ভাগ ভুক্তভোগী। গঙ্গা অববাহিকার মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং সুন্দরবন এলাকার মানুষের আর্সেনিক যুক্ত পানীয় জল ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইবার খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হইল, জল লইয়া এত যে ভোগান্তি, তাহাতেও সমাজের কোনো সচেতনতা দৃষ্ট হয় না। পশ্চিমবঙ্গে ১২ জুলাই ঘটা করিয়া 'জল বাঁচান, জীবন বাঁচান' দিবস পলিত হইলেও তাহা শুধুমাত্র মিটিং মিছিলেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। জল সংকটের ফলে একটি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিতে পারে, তাহা অনুধাবন করিয়া সমগ্র সমাজে একটি ব্যাপক জনআন্দোলন সংঘটিত হইলেই এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

### সুভাষিতম্

**কামং ক্রোধং তথা লোভং স্বাদ শৃঙ্গার কৌতুকে।**
**অতিনিদ্রা অতিসেবা চ বিদ্যার্থী হ্যাষ্ট বর্জয়েৎ।।**

**কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বাদ, শৃঙ্গার, কৌতুক, অতিনিদ্রা ও অতিসেবা গ্রহণ– এই আট রকমের কাজ বিদ্যার্থীদের বর্জনীয়।**

# ২০২৪ ও ২০২৬ দুটোই পাখির চোখ

সকলকে চমকে দিয়ে ২০২৩-এ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড় জিতেছিল বিজেপি। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো মুখ ছিল না। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। তাই তৃণমূল আর বিজেপি-র লোকসভার প্রার্থী তালিকা দেখে মনে হচ্ছে দু'দলেই রাজ্য নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছে। তাদের অগ্নিপরীক্ষা। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে আগেই জানিয়েছেন বিজেপি চালিত এনডিএ তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসতে চলেছে। মমতার মতে কংগ্রেস ৪০ আসন পাবে না আর খাড়গের মতে এনডিএ ৪০০ আসন পেরিয়ে যাবে। সংখ্যা যাই হোক এটা পরিষ্কার যে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।

এখনও পর্যন্ত রাজ্য বিজেপি ও তৃণমূল ১৮ জন বিধায়ককে সাংসদ প্রার্থী করেছে। এরা সাংসদ হলে উপনির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভার কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বরানগর ও ভগবানগোলা উপনির্বাচনের প্রার্থী দিয়েছে দুই দল। বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা করলেও বিদেশি বামপন্থী ও কংগ্রেস খাবি খাচ্ছে। আনুমানিক ৩৪ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলযোগ। বিধানসভার নিরিখে ১৪১টি আসন নিবিড়ভাবে মুসলমান আর ১৫১টি স্বল্পভাবে প্রভাবিত। ২০২১-এর রাজ্য ভোটে ওইসব আসনে বিজেপি ৩৫ (২১ আসন) আর ৪১ (৫৬ আসন) শতাংশ ভোট পায়। তৃণমূল ৫১ (১১৯ আসন) আর ৪৬ শতাংশ (৯৫ আসন) ভোট পায়। বাম-কংগ্রেসের ভোট ছিল ১১ আর ৯ শতাংশ। তারা কোনো আসন পায়নি। এখন মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক দল আইএসএফের প্রার্থী পদ নিয়ে টানাটানি। মুসলমান প্রধান ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে তৃণমূল বাদে এখনো কোনো প্রধান দল কেন প্রার্থী দেয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শুনছি আইএসএফ ৭ আসনে লড়বে। রাজ্যে তৃণমূলের মতোই বাম ও কংগ্রেস সংখ্যালঘু- ভোটনির্ভর দল।

লোকসভার নিরিখে রাজ্যে ২০টি আসন মুসলমান অধ্যুষিত। এটাই মমতার ভোটব্যাংক। মমতা এদেরকেই বলেন দুধেল গাই। এখানকার ১৯টি লোকসভা আসনে বাম-কং 'ব্যালান্সিং ফ্যাক্টর'— তুলাদণ্ড। নিজেরা ঠাঁইঠাঁই করে কিন্তু বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলের সঙ্গে মিলে ভাইভাই করে। মুসলমান ভোটব্যাংক ধরে রাখতে চায়। বিজেপি ঘোষিতভাবে মুসলমান রাজনীতি করে না অথচ তারা মুসলমান বিরোধী নয়। বিজেপি মুসলমান তুষ্টিকরণ করে ভোটব্যাংক বানাতে চায় না। মানুষ সেটা বোঝেন। তাই গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কং-কে অনেক পিছনে ফেলে বিজেপি মুসলমান এলাকা থেকেও যথাক্রমে ৩৫ এবং ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী বাছাই যে অনেক ভাবনাচিন্তা করে করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। না হলে মাত্র ৪২ আসনের জন্য প্রার্থী দিতে তিন দফা লাগে না।

**বিজেপি ঘোষিতভাবে মুসলমান রাজনীতি করে না অথচ তারা মুসলমান বিরোধী নয়। বিজেপি মুসলমান তুষ্টিকরণ করে ভোটব্যাংক বানাতে চায় না।**

রাজনীতিতে নতুন মুখ সন্দেশখালির প্রতিবাদী গৃহবধূ রেখা পাত্রকে বসিরহাট থেকে প্রার্থী করা তার বড়ো প্রমাণ। এখানে নরেন্দ্র মোদীর ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। মোদী জানিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্য— মহিলা, যুবক, কৃষক ও অনগ্রসর শ্রেণী। তা নজরে রেখেই রেখাকে প্রার্থী করা হয়েছে। বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে আগামীদিনে রেখার মতো সাহসী মহিলাদের তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামানো হবে। রেখা তার প্রতীক। যেমন তাঁর মতোই ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ার শালতোড়া কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী চন্দনা বাউড়ি। রাজ্যে ১৫৬টি বিধানসভা আসন গ্রাম প্রধান আর ১৩৬টি শহর ও শহরতলি আসন। '২১-এর ভোটে বিজেপি গ্রামে ৩৮ এবং শহরে ১৯টি, শহরতলিতে ২০টি মোট ৩৯টি আসন পায়। তবে ভোট পায় ৩৮ ও ৩৯.৯ শতাংশ। রাজ্যের ২৭টি লোকসভার আসন গ্রাম-প্রধান। ২০১৯-এর ভোটে বিজেপি তার মধ্যে ১৩টি আসন জিতেছিল। অনেক সমীক্ষাই বলছে এবারের ভোটে তা বাড়তে চলেছে। তার সঙ্গে রয়েছে ২০২৬-এর বিধানসভা জয়ের লক্ষ্য। আমার ধারণা লোকসভার পাশাপাশি তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণটা বেশ স্পষ্ট। হয়তো-বা একজন দূরদর্শী নেতা সকলকে হেঁকে বলছেন খবরদার, ২০২১-এর মতো পশ্চিমবঙ্গে আর যেন কোনো ভুল না হয়।

# রেখায় বলিরেখা দিদির কপালে!

চিন্তিতেষু দিদি,

বসিরহাটে ওই গৃহবধূ বড়োই চিন্তায় ফেলে দিয়েছে দিদি! একে তো মহিলা তাতে আবার নির্যাতিতাদের হয়ে প্রতিবাদী মুখ বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করায় আপনার দল যে বেশ চাপে তা বোঝা যাচ্ছে। আপনিও কি চিন্তায় নেই দিদি!

'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' স্লোগান নিয়ে ভোটে জিতেছিলেন বিধানসভায়। কিন্তু সন্দেশখালি নিজের মেয়েকেই সাংসদ চাইলে দোষ কোথায়? হতে পারে তিনি সমাজের উচ্চবিত্তের নন। আসলে দক্ষিণ কলকাতাকেন্দ্রিক আপনার দল গ্রামবাঙ্গলাকে কেমন চোখে দেখে তা সবার জানা। উত্তর কলকাতাতেই মেন নিতে পারে না আবার হদ্দ গ্রামের বধূ।

তার উপরে বড্ড গরিব রেখা পাত্র। ওঁর স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। আগে মৎস্যজীবী থাকলেও শাজাহান বাহিনীর অত্যাচারে কে আর নিজের পেশা ধরে রাখতে পেরেছে বলুন ভেড়ি সর্বস্ব ওই এলাকায়। আপনি অবশ্য মুখে কিছু বলছেন না। আচ্ছা দিদি, আপনি তো এই মহিলাদের উন্নতির জন্যই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছেন। ভোটের আগে সেই টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এই ধরনের গরিব মানুষের জন্যই তো আপনার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প! তবে রেখার সেই কার্ড থাকায় আপত্তি কীসের? দিদি, এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না কীর্তি আজাদ বা ইউসুফ পাঠানরা বাদ দিলে রাজ্যের সব দলের, নির্দলের প্রার্থীরাই কিন্তু আপনার রাজ্যের বাসিন্দা। আপনি সকলের মুখ্যমন্ত্রী। আপনার সব প্রকল্পই এঁদের সকলের জন্য।

কিন্তু কী হলো! আপনার দলের তৃণমূলের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে রেখাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ট্যাগ করা হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষে লেখা হয়েছে, 'হাতেনাতে ধরা পড়েছে। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের দ্বিচারিতার খেলা ধরা পড়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের সুযোগসুবিধা নিয়ে নিজে দিল্লির জমিদারদের সহযোগী হয়েছেন।' এরপর প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে আরও লেখা হয়েছে, 'আপনি আগামীবার যখন ফোন করবেন, তখন জেনে নেবেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের ব্যাপারটা। আমাদের নেত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।' এমন লেখার সঙ্গে সঙ্গে সমাজমাধ্যমে রেখার নামের স্বাস্থ্য সাথী কার্ডটিও পোস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রার্থী হওয়ার পরেই রেখাকে ফোন করেছিলেন মোদী। সেই কারণেই তৃণমূলের আক্রমণের তির যে মোদীর দিকেও তা আমি বুঝেছি দিদি।

কিন্তু আমার একটা সহজ প্রশ্ন রয়েছে। সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছেন বলে এত রাগ! এত নীচ রাজনীতি! রেখা পাত্রের সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হলো? ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণও! এর ফলে যদি কোনও ঘটনা ঘটে তার জন্য কে দায়ী থাকবে দিদি? ওই কার্ডের ছবি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ কিন্তু আপনি দেননি। দিদি, এমনিতেই এই প্রকল্প নিয়ে অনেক বিতর্ক। কাজের কাজ হয় না বলেই বেশি অভিযোগ। এরাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্যান্য রাজ্য থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে যাচ্ছেন। আর আপনি পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করতে দেননি। তা হলে রেখারা কী করবেন? আচ্ছা, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিলে কি সবাইকে তৃণমূল করতে হবে? এমন তো ওই প্রকল্পের কোথাও বলা নেই!

**বসিরহাটের প্রার্থী রেখা প্রশ্ন তুলেছেন, 'তৃণমূল কি বলতে চাইছে যে, সরকারি সুবিধা নিতে গেলে তৃণমূল করতে হবে?' প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে এনে রেখা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে সুযোগ-সুবিধাগুলো দেন পশ্চিমবঙ্গে, তিনি কিন্তু একবারও বলেননি যে, এই সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে গেলে বিজেপি করতে হবে।**

একই প্রশ্ন তুলেছেন রেখাও। বলেছেন, 'তৃণমূল কি বলতে চাইছে যে, সরকারি সুবিধা নিতে গেলে তৃণমূল করতে হবে?' প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে এনে রেখা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে সুযোগ-সুবিধাগুলো দেন পশ্চিমবঙ্গে, তিনি কিন্তু একবারও বলেননি যে, এই সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে গেলে বিজেপি করতে হবে। আর করোনা টিকা, যেটা নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন, যেটা নিয়ে বেঁচে আছেন তৃণমূলের নেতারা। একবারও নরেন্দ্র মোদী বলেননি যে আমি টিকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি।' একই সঙ্গে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেন, 'দিদির ভাইপো স্বাস্থ্য সাথীতে চিকিৎসা করান না। চিকিৎসা করাতে যান আমেরিকায়।'

শেষ কথাটা নিয়ে আমি আপনার অস্বস্তি বাড়াব না। কপালের যত্ন নিন। রক্তের সেই ছবি দেখার পর থেকেই চিন্তায় রয়েছি। একে ক্ষত, তার উপরে রেখা প্রার্থী হওয়ায় আপনার কপালে বলিরেখাও দেখা যাচ্ছে।

অতিথি কলম

দীপঙ্কর গুপ্ত

# ভারতীয় যুবসমাজ ও ভারতের দেবদেবী

হিন্দু যুবসমাজ পূজা-অর্চনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সমাজের বয়োবৃদ্ধদের হাতেই ন্যস্ত বলে এতদিন ভাবনাচিন্তা করেছে। মোটামুটি গত শতাব্দী থেকে এই ধারণার পরিবর্তন শুরু হলেও ২০০৫ সাল হতে এই দৃঢ়চেতা যুবকরা সাহসের সঙ্গে নিজেদের মতো করে তাদের ধর্মাচরণকে ভিন্ন আঙ্গিকে কল্পনা করে এবং তার এক অন্য রূপ দান করতে শুরু করে। তারা পূজারি ও পূজাপদ্ধতি, আচার-বিচার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ঈশ্বরীয় সংযোগের ক্ষেত্রে অন্য কারুর হস্তক্ষেপরহিত ও মধ্যস্থতাবিহীন এক প্রক্রিয়ায় ঐশী জগতের সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনের প্রয়াস বা সাধনার পথের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়।

পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পেশাদাররাও লক্ষ্য করেছেন যে পুরুষরা বিশেষত যুবকরা পুনরায় তীর্থযাত্রায় আকর্ষিত হচ্ছেন। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এই যুবকরা অধিকাংশই বাবা-মা বা অভিভাবকস্থানীয় কাউকে ছাড়াই নিজেদের পছন্দমতো তীর্থ ভ্রমণে বের হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রদর্শিত পথে হেঁটে তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী পূজার্চনার পরিবর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার লক্ষ্যে তারা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে আগ্রহী। আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষিত যুবসমাজের তুলনায় মধ্যবয়স্ক দম্পতি এবং ভগবানের জয়ধ্বনিরত দলবদ্ধ পরিবারগুলির তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ বর্তমানে অনেকটাই কম।

ধর্মীয় অ্যাপ ওম টিভির তরফে প্রকাশিত রেকর্ড বা তথ্য অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সিরাই সবচেয়ে বেশি তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে তারা সাইটের অন্তর্গত অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষ ইত্যাদি অংশের প্রতি আকর্ষিত না হলেও গীতার বিভিন্ন অধ্যায় তাদের এই আকর্ষণের কারণ। গীতার অমৃতবাণী তাদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। এছাড়া, ওম টিভি অ্যাপের ৮৫ শতাংশ সাবস্ক্রাইবার বা গ্রাহক হলো পুরুষ এবং তারা এই অ্যাপের ব্যবসার 'হিন্দিভাষী' বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

বিশোর্ধ্ব ও ত্রিশোর্ধ্ব হিন্দু যুববৃন্দ পূজার্চনার এক নতুন আঙ্গিক হাজির করেছে, দেব উপাসনাকে এক নতুন রূপ দান করেছে যা অপেক্ষাকৃত কম আচার-অনুষ্ঠানধর্মী এবং অধিকতর উপলব্ধিমূলক। ভারতীয় যুব সম্প্রদায় ধর্মের মধ্যে যা কিছুর সন্ধান করে চলেছে, তার সঙ্গে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তাধারার কোনো সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। তীর্থযাত্রা সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ নতুন, এমনকী তাদের সেই মানসিকতার প্রতিফলন তাদের অভিভাবকদেরও প্রায়শই হতবাক ও হতচকিত করে। তাদের ভাবনায় একটি মন্দির বা কোনো পূজারি এই ক্ষেত্রে আর মূল বিষয় নয়। যুবসমাজ কারুর সহায়তা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই ঐশ্বরিক জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে উৎসাহী, যে সংযোগসূত্র বা সাধনা তাদের নিজস্ব এবং একান্ত আপন। উদাহরণস্বরূপ, তাদের পূর্বজ ও অগ্রজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং অনুসৃত পরম্পরার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে যুবক কাঁওয়ারিয়ার দল হরিদ্বার তীর্থযাত্রাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পবিত্র জলের বাঁক কাঁধে নিয়ে একাকী হেঁটে যাওয়া কাঁওয়ারিয়া যাত্রীর পাশাপাশি সবেগে ধাবমান কাঁওয়ারিয়া যুবকরা রিলে পদ্ধতিতে একে অপরের মাধ্যমে পবিত্র জল বহনের পন্থা নিয়েছে। প্রায়শই এই দলগুলি মোটরসাইকেল ও ট্রাকে গানবাজনা সহকারে একসঙ্গে গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে চলে এবং এহেন তীর্থযাত্রার মাধ্যমে আরেক দল ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীকেও চলে পবিত্র জল সরবরাহ।

সম্পূর্ণ পৃথক পন্থা অবলম্বন ও আলাদা ভাবধারায় পরিচালিত হওয়া ছাড়াও এই যুবকরা ধর্মীয় পাণ্ডা বা পুরোহিতদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রায় অনুভবই করে না, যাঁরা এককালে এই তীর্থযাত্রায় নেতৃত্ব দিতেন, যাঁদের নেতৃত্বে এই ছেলেপুলেদের অভিভাবকরা সেই সময় তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন। বর্তমান প্রজন্মের এই কাঁওয়ারিয়ার দল চরম আনন্দের সঙ্গে আজ পাণ্ডা ও ধর্মগুরুদের নেতৃত্বহীন। গন্তব্য অভিমুখে তাদের এই লং মার্চ বা সুদীর্ঘ যাত্রা সঞ্চার করে অনাবিল উচ্ছ্বাসের এক তীব্র অনুভূতি, যা তাদের অভিভাবকরা হয়তো কোনোদিন অনুভব করতে পারেননি। এখন এটিই হলো ধর্মাচারের আধুনিক স্বরূপ। নতুন প্রকৃতির এই যাত্রা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় এমন এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের যেখানে সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষগুলি আর কোনোদিন হয়তো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেন না। বন্ধুত্বের সম্পর্কের এই আভা 'প্রাচীন পরম্পরা উদ্ভূত' হয়তো নয়, কিন্তু একটি নতুন পরিচয়, একটি ভিন্ন সত্তার পুনর্নির্মাণ সূচিত করছে যে বিষয়ে প্রবীণ প্রজন্ম বাস্তবিকই স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কাঁওর তীর্থযাত্রা চলাকালীন রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামলেও প্রকৃতপক্ষে খুব সামান্যই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। এই তীর্থযাত্রা নিঃসন্দেহে প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পৌরুষদীপ্ত বিষয়, কিন্তু এই যাত্রার প্রাক্কালে যে ধরনের উদ্দামতা, এমনকী উচ্ছৃঙ্খলতা, হুজ্জোতি দেখা

যায়, তা মূলত স্বতঃপ্রণোদিত, স্বতঃপ্রবৃত্ত। এই দুই সপ্তাহে অস্থির ও চঞ্চলমতি যুবকরা আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিজেদের আস্থা ও বিশ্বাসকে সংহত করে তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী নিজেদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার যোগ্য করে তোলে। অন্ধকার জগতের হাতছানি উপেক্ষা করে এই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া এইভাবেই যুব সম্প্রদায়কে বিপথগামী হওয়া থেকে সদা বিরত রাখে।

একবিংশ শতাব্দীর (অর্থাৎ ২০০০ সাল হতে) গোড়ার দিকেই কাঁবর যাত্রায় অংশগ্রহণকারী বা কাঁওয়ারিয়াদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। কয়েক দশক দীর্ঘ আর্থিক মন্দার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে একবিংশ শতকের এই প্রারম্ভিক পর্বেই শহরকেন্দ্রিক আর্থিক বৃদ্ধির গ্রাফ বা রেখচিত্র ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। ১৯৮১ সাল হতে শ্লথগতির শিকার হয়ে শহরকেন্দ্রিক প্রগতি ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তারপর ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী আকস্মিকভাবেই শহরাঞ্চলে ব্যাপক আর্থিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। মাঝের কিছু ঘটনাপ্রবাহ সত্ত্বেও ২, ৭৭৪টি নতুন শহরভিত্তিক আর্থিক কেন্দ্র বা আর্বান সেন্টারের তথ্য এই গণনায় নথিভুক্ত হয়। অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ, কাজের সন্ধানে মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, বাড়তে থাকে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে মহিলারাও ক্রমশ শহরমুখী হতে থাকেন। কাজের খোঁজে পুরুষেরা শহরমুখী। গ্রামগঞ্জগুলি হয়ে ওঠে কিছু বয়স্ক মানুষ এবং চিরকালীন জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে তাদের চিরাচরিত জীবিকা নির্বাহের স্থান। বহির্জগতের হাতছানিতে আকর্ষিত গ্রাম্য যুবসমাজ এই কষ্টকর গ্রামীণ জীবনের সংসর্গ উপেক্ষা করে।

সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসের ওপর এক প্রবল, দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার করেছে অধুনা 'ব্যাপক নগরায়ন', যা এক কথায় অনস্বীকার্য। যেহেতু কাজের খোঁজে যুবকদের গ্রামের বাইরে পা রাখতে হয়, সেহেতু যৌথ পরিবারগুলি ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। যার পরিণামে প্রায় ৫৮ শতাংশ পরিবার আজ দম্পতি এবং তাদের সন্তানকেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার পরিবারে পরিণত হয়েছে। এই প্রজন্মের পিতা-মাতাকে সন্তানের থেকে যেন অর্জন করতে হচ্ছে মান-সম্মান। এই অভিভাবকরা আজ তাঁদের প্রতি সেই একান্নবর্তী পরিবারের বংশ পরম্পরাগত সহায়তা-সমর্থনহীন। গ্রাম ও শহরের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে সন্তানের থেকে প্রাপ্য সম্মান অর্জনের এহেন কাজটি নিতান্তই কঠিন ও দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষত যখন যৌথ পরিবার ভাঙনের ফলে অভিভাবককুল তাঁদের পূর্বের গরিমা ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। আন্তঃপ্রজন্মীয় সম্পর্কগুলি যখন সম্মুখীন হয় চড়াই-উতরাইয়ের, তখন তা দুই বা ততোধিক প্রজন্মের নান্দনিক পছন্দ, জীবনচর্যা এমনকী পূজার্চনা, উপাসনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলিকেও প্রভাবিত করে। ঐতিহ্যবাহী প্রথাগুলি আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। এই প্রথাগুলির নবোত্থান না ঘটলে কালের নিয়মে তা অপ্রচলিত হয়ে পড়বে।

কাঁওর যাত্রা একমাত্র বিষয় নয় যার সঙ্গে সম্পর্কিত চিরাচরিত, পরম্পরাগত উৎসব-অনুষ্ঠানের ধারায় আজ পরিবর্তন এসেছে। অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও আজ এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রতীয়মান হচ্ছে। মহাশিবরাত্রি উদ্‌যাপনও বর্তমানে যুববৃন্দ সমন্বিত ধর্মীয় কার্যক্রমে বিবর্তিত হয়েছে, যার মধ্যে ঘটেছে পৌরুষ প্রদর্শনের নব উন্মেষ। কাঁওর যাত্রা অপেক্ষা ছোটো মাপের হলেও এখানেও হাইওয়েগুলিতে যুবকদের ঢল নামছে এবং রিলে দৌড়ের মাধ্যমে তাদের তরফে পবিত্র জল স্থানান্তরণের প্রক্রিয়া চলছে।

এসবের বিপ্রতীপে, নগরায়ন যখন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই কালখণ্ডে দাঁড়িয়ে জীবনে শিকল ভাঙা মুক্তির অভিপ্রায়ে এই যুবসমাজের কাছে তীর্থযাত্রা কিন্তু কোনো উপলক্ষ্য নয়। ইওরোপের সবচেয়ে বড়ো মাপের ও দীর্ঘতম তীর্থযাত্রা হলো ৫০০ মাইল (৮০০ কিলোমিটার) ট্রেক করে স্যান্টিয়াগো ডি কম্পোস্টেলা যাত্রা। এই যাত্রার রুটিন বা দৈনন্দিন কার্যসূচি সুষম ও সুসংগঠিত। বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না এই তথ্যে যে তরুণ কাঁওয়ারিয়াদের থেকে ভিন্ন এই তীর্থযাত্রীদের গড় বয়স ৪৫ বছরের বেশি।

কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে আজকের কাঁওয়ারিয়া যুবকের দল একদিন হারিয়ে যাবে, তারা যেন এক ধূসর অতীতে পরিণত হবে। কিন্তু পরবর্তী নবীন প্রজন্ম হয়তো ট্রাফিক (পরিবহণ) ও শব্দ দূষণের সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনেই তীর্থযাত্রায় শামিল হবে।

**(লেখক একজন সমাজবিজ্ঞানী)**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

## শোক সংবাদ

কলকাতা মানিকতলা শাখার প্রয়াত স্বয়ংসেবক যোগেন্দ্র শ্রীবাস্তবের সহধর্মিণী এবং মানিকতলা শাখার স্বয়ংসেবক সঞ্জয় (বাবুয়া) শ্রীবাস্তবের মাতৃ দেবী কৃষ্ণা শ্রীবাস্তব গত ২১ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ কন্যা, জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত বিভাগ সঙ্ঘচালক গৌরহরি সামন্তের সহধর্মিণী তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্যা আল্পনা সামন্ত গত ১৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন।

# সোমালিয়ার জলদস্যুদের বিরুদ্ধে বড়ো সাফল্য

## পাকিস্তানিদের কণ্ঠে ‘ভারত জিন্দাবাদ’ স্লোগান

সোমালিয়ার জলদস্যুদের বিরুদ্ধে গত মার্চ মাসেই উপর্যুপরি দুবার সাফল্য পেল ভারতীয় নৌসেনা। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এই সাফল্য নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক অতীতে বহুবার তারা এমন সাফল্য পেয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে মৎস্যজীবীরা আরবসাগরে মাছ ধরতে যান, মূলত তাদেরকেই টার্গেট করে জলদস্যুরা। এইভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মৎস্যজীবীদের কাছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা যেমন ত্রাসের সঞ্চার করে, অন্যদিকে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতেও থাবা বসায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় নৌসেনার সক্রিয়তা শুধু বিপন্ন ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। ইরানি জাহাজ, পাকিস্তানি নাগরিকদের উদ্ধার করার ক্ষেত্রেও নৌসেনা কোনো সীমান্তের বাধা বা কূটনৈতিক সম্পর্ক-কে বিচারের মধ্যে রাখছে না। ভারতীয় সেনার এই মহানুভবতাকে কূটনীতির মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল, পাকিস্তানি মৎস্যজীবীদের ‘ভারত জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দেওয়ায়।

এই মার্চ মাসের মাঝামাঝি চল্লিশ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অভিযান চালিয়ে সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাত থেকে পণ্যবাহী জাহাজ এম ভি রুয়েন-কে উদ্ধার করে আইএনএস কলকাতা। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে এই পণ্যবাহী জাহাজটিকে অপহরণ করা হয়েছিল। আরব সাগরে টহলদারির কাজে নিযুক্ত আইএনএস, কলকাতা সোমালিয়ার পূর্বে প্রায় ২৬০ নটিক্যাল মাইল দূরে জাহাজটিকে চিহ্নিত করে। ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ সকালে অভিযান শুরু করে আইএনএস কলকাতা এবং ড্রোনের মাধ্যমে জাহাজটির মধ্যে সশস্ত্র জলদস্যুদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। জলদস্যুরা ড্রোনটিকে গুলি চালিয়ে ধ্বংস করে এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এরপর আন্তর্জাতিক আইন মেনে ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমিয়ে জাহাজটিকে আটকাতে সক্ষম হয় ভারতীয় নৌসেনা।

আইএনএস কলকাতার অভিযানের মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় জলদস্যুরা। আইএনএস কলকাতা ছাড়াও এই অভিযানে শামিল করা হয়েছিল টহলদারি জাহাজ আইএনএস সুভদ্রা এবং পি-৮ আই নজরদারি বিমানকে। এছাড়াও সি-১৭ বিমান থেকে কম্যান্ডোদের ‘এয়ার ড্রপ’ করা হয়েছিল। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার দূরে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় আকাশপথে নৌ-কম্যান্ডোদেরও নামানো হয়।

এদিকে মার্চ মাসের শেষে ইরানের পতাকাধারী জাহাজ আল কাম্বার সদ্য আরবসাগরের বুকে সোমালি জলদস্যুদের পাল্লায় পড়েছিল। আরবসাগর জুড়ে জলদস্যুর হানা রোধে তৎপর ভারতীয় নৌসেনা সেই খবর পায়। ইরানের পতাকাধারী সেই মাছ ধরার ভেসেলে ছিলেন ২৩ পাকিস্তানি। ঘটনাটি ২৮ মার্চের। জলদস্যুদের হানা থেকে জাহাজটিকে উদ্ধারে রুদ্ধশ্বাস অভিযানে নামে ভারতীয় নৌসেনা। শেষমেশ ২৩ পাকিস্তানি সহ-ভেসেলটি উদ্ধার হতেই, রক্ষা পাওয়া পাকিস্তানিদের কণ্ঠেও ‘ভারত জিন্দাবাদ’ ধ্বনি শোনা যায়।

দেশ, সীমানার পরোয়া না করে জলপথে নিরাপত্তায় ও প্রাণরক্ষায় ভারতীয় সেনা যে কতটা ব্রতী তা প্রমাণ করেছে এই ঘটনা। ভারতীয় সেনার হাতে শেষমেশ ধরা পড়ে ওই সোমালি জলদস্যুরা। ওদিকে, ভারতীয় সেনার দুঃসাহসিক অভিযানে রক্ষা পেয়ে ২৩ পাকিস্তানিও শেষমেশ স্লোগান দেন, ‘ভারত জিন্দাবাদ’। সোকোত্রা ভেসেল ৯০ নটিক্যাল দক্ষিণ-পশ্চিমে সোমালি জলদস্যুদের হাতে আটক পড়া ইরানের ভেসেল ছাড়াও একাধিক ভেসেল উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছে দেশে নৌবাহিনী। ভারতীয় নৌসেনার সুসংহত অভিযানের মুখে ১৬ মার্চ সোমালিয়ার ৩৫ জন জলদস্যু আত্মসমর্পণ করে। এমভি রুয়েন-এর ১৭ জন কর্মীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ৩৭,৮০০ টন পণ্যবাহী এই জাহাজটিকে নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

ভারতের রণতরী আইএনএস সুমিত্রা জলদস্যুদের হাতে আটক ১৯ পাকিস্তানি নাবিককে উদ্ধার করেছে। সোমবার সোমালিয়ার পূর্ব উপকূলে পাকিস্তানি নাবিক ও তাদের মাছ ধরার জাহাজটিকে অপহরণ করে জলদস্যুরা। ভারতের নৌবাহিনী জানিয়েছে, গত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে এটি দ্বিতীয় অভিযান। একদিন আগেই রণতরী আইএনএস সুমিত্রা ইরানের পতাকাবাহী অপর একটি মাছ ধরার জাহাজের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়েছিল। এফতি ইমান নামের জাহাজটিকেও সোমালি জলদস্যুরা অপহরণ করে। পরবর্তীতে ১৭ জন ইরানি ক্রুকে উদ্ধার করা হয়।

নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ’৩৬ ঘণ্টার ব্যবধানে আইএনএস সুমিত্রা দ্রুত, অবিচল ও নিরলস উদ্যোগের মাধ্যমে দুইটি অপহরণকৃত মাছ ধরার জাহাজ ও জাহাজের ৩৬ ক্রু (১৭ ইরানি ও ১৯ পাকিস্তানি) উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কোচি থেকে প্রায় ৮৫০ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে, দক্ষিণ আরবসাগরে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যাতে এই মাছধরার জাহাজগুলোকে পরবর্তীতে অপর কোনো বাণিজ্যিক নৌযানের বিরুদ্ধে জলদস্যুতায় ‘মাদার শিপ’ হিসেবে ব্যবহার করা না যায়’। প্রসঙ্গত, আইএনএস সুমিত্রা হচ্ছে ভারতের নৌবাহিনীর উপকূল প্রতিরক্ষা জাহাজ। এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে সোমালিয়ার পূর্বাঞ্চল ও এডেন উপসাগরে জলদস্যুতা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করা। □

# ভারতীয় চিকিৎসাপ্রণালী ও পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া

**ব্রিটিশ শাসনকালে ড্রাগ অ্যাক্ট, ১৯৪০ নামে এক আইন ছিল। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে অনেক রোগের চিকিৎসার দেশীয় উপায় ছিল যা ইংরেজ ডাক্তারদের অজানা। সেইসব জাদুকরি, অবাস্তব ও কুসংস্কাররূপে বিবেচিত হবে। গ্রামীণ ডাক্তার যাদের চিরাচরিত দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অনুশীলন করতে দেখা যাবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এটাই নেহরু ১৯৫৪ সালে ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট নামে চালু করেন। এখন বাবা রামদেবের বিরোধিতার জন্য এই আইনকে কাজে লাগানো হচ্ছে।**

**সুদীপনারায়ণ ঘোষ**

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ভারতে যখন বেদাদির মতো অতি উচ্চস্তরের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তখন ইউরোপের মানুষ গায়ে নীল রং মেখে ঘুরে বেড়াত, কাঁচা মাংস খেত। প্রাচীন ভারত জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, প্রযুক্তি, ধাতুবিদ্যা, সামুদ্রিক বা সামরিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সব কিছুতেই উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

ব্রিটিশরা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ভারত দখল করেছিল। ১৬০৮-এর ২৪ আগস্ট প্রথম সুরাটের উপকূলে তারা নামে। তারা ধীরে ধীরে পুরো দেশ দখল করে। ১৭৫৭-এ পলাশী এবং ১৭৬৪-তে বক্সারের যুদ্ধে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ভারতকে নির্মমভাবে শাসন ও শোষণ করেছিল, ঠিক তুর্কি-মুঘলদের মতো যারা ৮০০ বছর নির্মম শাসন চালিয়েছিল।

ব্রিটিশরা ভারতকে খ্রিস্টান দেশে পরিণত করতে চেয়েছিল, যেমন তারা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় করেছিল। ব্রিটিশ শাসক গভর্নর-জেনারেল বেন্টিঙ্ক কুখ্যাত কূটনীতিবিদ টমাস ব্যাবিংটন মেকলেকে ভারতে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা গুরুকুলের পরিবর্তে ব্রিটিশ কনভেন্ট শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

১৮৩৪-এ মেকলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে লিখেছিলেন, 'আমি এই বিশাল দেশের সর্বপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছি গ্রামের চালু গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা দেখতে। আমরা যদি এই দেশকে চিরকাল শাসন করতে চাই তবে আমাদের তাদের আদি সবকিছু বাতিল করতে হবে এবং তাদের মনে হীনমন্যতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। ১৮১১ সালে প্রথম ব্রিটিশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে সারা ভারতে ৭,৩২,০০০ গুরুকুল বিদ্যালয় ছিল।

ব্রিটিশরা সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাজের জন্য এমন কিছু আজ্ঞাবহ দাস চেয়েছিল যারা দেখতে ভারতীয় হবে কিন্তু মন-মস্তিষ্কে ব্রিটিশ। সেজন্য তারা গুরুকুলের পরিবর্তে পশ্চিমি কনভেন্ট শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। তারা ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদ, যোগব্যায়াম এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা যা এই দেশে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আবির্ভাবের আগে ভারতে অনাদিকাল থেকে প্রচলিত ছিল তাকে অস্বীকার করে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের প্রবর্তন করেছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালে ড্রাগ অ্যাক্ট, ১৯৪০ নামে এক আইন ছিল। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে অনেক রোগের চিকিৎসার দেশীয় উপায় ছিল যা ইংরেজ ডাক্তারদের অজানা। সেইসব জাদুকরি, অবাস্তব ও কুসংস্কাররূপে বিবেচিত হবে। গ্রামীণ ডাক্তার যাদের চিরাচরিত দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অনুশীলন করতে দেখা যাবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

সেই কঠোর আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা, যা প্রতিটি গ্রামে এক বিশাল বটগাছের নীচে গুরুকুলের দক্ষ পণ্ডিতদের দ্বারা লক্ষাধিক ছাত্রদের শেখানো হতো তা দমন করা, এছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সারা ভারতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে ছাত্রদের শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, কৃষি ও নিযুদ্ধ (মার্শাল আর্ট) শেখানো হতো। গুরুকুল ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস করা হয়েছে, অন্যান্য অনেক ঐতিহ্যবাহী জিনিসের মতো, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা ৫০০০ বছর ধরে অনুশীলন করে এসেছেন।

ভারতবাসী ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭, স্বাধীনতা পেয়েছে। এটা শ্বেত থেকে বাদামি প্রভুদের হাতে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' ব্যতীত কিছুই ছিল না। নেহরু একই পথে হাঁটেন এবং ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট, ১৯৫৪ প্রবর্তন করেন। তিনি কখনও সুশ্রুত বা চরক সংহিতা পড়েননি। ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত, আয়ুর্বেদ, যোগ বা দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। তারা কেউই আচার্য বাগভট্ট, আচার্য সারঙ্গদেব বা আচার্য ভবমিশ্র সম্পর্কে পড়েননি বা কোনো জ্ঞান অর্জন করেননি।

আয়ুর্বেদ বা পঞ্চমবেদ অথর্ববেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা মানুষের কাছে অনাদিকাল থেকে পরিচিত। পতঞ্জলির যোগব্যায়াম পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা

ফঃ ২

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে গার্হস্থ্য অনুশীলন ছিল যা প্রকৃতপক্ষে 'সিল্ক-রুট' নামে এক বাণিজ্য পথের মাধ্যমে মরুভূমি আরব ভূমিতে এবং তারপর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু গবেষক, যেমন রাজীব মালহোত্রা দাবি করেন যে হানাদাররা ভারত থেকে শুধু সম্পদ ও অর্থ লুট করেনি, তারা মহর্ষি চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট ও সারঙ্গদেব-সহ আমাদের বহু প্রাচীন জ্ঞানগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থও লুট করেছে। এটা দাবি করা হয়েছে যে পণ্ডিতদের সংস্কৃত থেকে আরবি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

মেলবোর্নের রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অব সার্জনসের সামনের গেটে মহর্ষি সুশ্রুতের (৬০০ খ্রি:পূ:) একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত বিশ্বের প্রথম সার্জন ছিলেন। মহর্ষি সুশ্রুতকে প্লাস্টিক সার্জারির জনক বলা হয়। কপালের চামড়ার ফ্ল্যাপ নিয়ে তিনি একটি বিকৃত নাক পুনর্গঠন করেন। তিনি দন্তচিকিৎসা, কান, নাক ও চোখ, গাইনোকোলজিকাল এবং প্রসূতি অপারেশনে ১২৫টি অস্ত্রোপচারের যন্ত্র এবং ২০০টিরও বেশি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু মানুষের চিকিৎসাই করেননি, প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগ নিয়েও গবেষণা করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ সম্পর্কে জানতেন, সেইসব রোগের চিকিৎসা ভেষজ ওষুধ দিয়ে করা হতো। আজ অ্যালোপ্যাথিতে ব্যবহৃত ১২০টি ওষুধ ভেষজ থেকে পাওয়া যায়। এর উজ্জ্বল উদাহরণ হলো কার্ডিওটোনিক ডিজিটালিস এবং ল্যানাটোসাইড, সিঙ্কোনা বাকল থেকে ম্যালেরিয়া ওষুধ, উইন্টারগ্রিন গাছের ছাল থেকে ব্যথানাশক স্যালিসাইলেট, বারোমাসি সাদাবাহার থেকে ভিনকা অ্যালকালয়েডের মতো ক্যান্সার-প্রতিরোধী ওষুধ এবং সাধারণ বন্য ম্যাপল গাছ থেকে পোডোফাইলিন তৈরি করা হতো।

দক্ষিণ ভারতে কেরালীয়ায়ুর্বেদসমাজম হলো আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় উৎকর্ষের একটি কেন্দ্র, যেখানে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ থেকে রোগীরা প্রায়ই নিরাময়ের জন্য আসেন। কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গা, এর্নাকুলামের কুথাট্টুকুলামের শ্রীধারিয়াম আয়ুর্বেদিক আই কেয়ার হাসপাতালে প্রদত্ত চিকিৎসা পরিষেবাগুলির প্রশংসা করেছিলেন। কারণ এই চিকিৎসাকেন্দ্র তাঁর মেয়ের হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল। এটা ছিল আয়ুর্বেদের বিস্ময় যা সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করেছে।

অতীতের দাসত্বের শৃঙ্খল ত্যাগ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানে এক নতুন ভারত গড়ে উঠছে। বাবা রামদেব ভারতের ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদ, যোগ এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার ও পুনরুত্থানের উদ্যোগ নিয়েছেন।

অনেক দেশ-বিরোধী স্টেকহোল্ডার, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) এবং বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে যোগসাজশে, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ী নিরাময়ের দাবিকে মিথ্যা বলে অভিযোগ করে বাবা রামদেবের সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা প্রথমে নিম্ন আদালতে গিয়েছিল এবং এখন ভারতে আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার গবেষণা অগ্রগতি ও বিকাশ বন্ধ করতে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে। সুপ্রিম কোর্ট শুধু বলেছে 'আয়ুর্বেদই সর্বোত্তম চিকিৎসা ও আলোপ্যাথি নির্বোধ'— বাবা রামদেবের পতঞ্জলির এই বিজ্ঞাপন ঠিক নয়। সেটা হতে পারে কিন্তু এতে আয়ুর্বেদের কার্যকারিতা ভুল সাব্যস্ত হয় না।

হার্বাল প্ল্যান্ট, হার্বাল নিউট্রাসিউটিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, কসমেসিউটিক্যাল, প্ল্যান্ট ডেরিভেটিভস্ ও প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্টের বহুবিধ সাব-সেক্টর সমৃদ্ধ ভারতীয় আয়ুশ সেক্টর বা ভেষজ শিল্পের আর্থিক বৃদ্ধি ২০১৪ থেকে ২০২০-র মধ্যে হয়েছে ১৭ শতাংশ। ভেষজ ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প ২০১৪ সালে ১০৯ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ১৫৪ কোটি ডলার হয়েছে, বার্ষিক ৫.৯ শতাংশ বেড়েছে যাকে খুব শক্তিশালী বৃদ্ধিহার বলা যায়। ভারত ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬২.৮ কোটি ডলার মূল্যের আয়ুশ ও ভেষজ পণ্য রপ্তানি করেছে, যার মধ্যে সোওয়া রিগপা, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদ থেকে ভেষজ সম্পূরক ও ওষুধ রয়েছে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বার্তা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতে দেশবিরোধী শক্তিসমূহ দেশীয় ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর বিরোধিতা করে গাজওয়া-ই-হিন্দকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য পুরোদমে কাজ করছে। সবাই জানেন যে মুসলমান ব্যবসায়ীরা ভারতে জিহাদের প্রচারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

অন্যদিকে বাবা রামদেবের পতঞ্জলি যোগপীঠ ও আরোগ্য কেন্দ্রের কাজ, অর্থাৎ যোগ, আয়ুর্বেদ, সনাতন ধর্ম (হিন্দুধর্ম) ও সংস্কৃতির (সভ্যতামূলক) প্রচার ও অগ্রগতি এখন বিশ্ব দ্বারা স্বীকৃত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। এই পদক্ষেপ দেশবিরোধী মনোভাব-পোষণকারীদের ক্ষুব্ধ করেছে।

এটা স্পষ্ট যে বাবা রামদেব কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নামক বিরোধী শক্তির বিরক্তি উৎপাদন করেছেন, এরা ভারতে ২৮টি দেশবিরোধী এবং ভারতবিরোধী মুসলমান ভোট বুভুক্ষু প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছে। ২০১১ সালে বাবা রামদেব দিল্লির রামলীলা ময়দানে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছিলেন, বিদেশি ব্যাংকে লুকিয়ে রাখা কালো টাকা পুনরুদ্ধারের দাবিতে। ইউপিএ-২ সরকার মধ্যরাতে বাবা রামদেবকে ঘটনাস্থল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় নির্দেশ দেয় পুলিশকে। সিপিআই(এম) নেত্রী বৃন্দা কারাত ২০০৬ সালে রটিয়েছিলেন রামদেবের তৈরি আয়ুর্বেদিক ওষুধে প্রাণী ও মানুষের হাড় পাওয়া গিয়েছিল।

তারা নেহরুর পুনঃপ্রবর্তিত ব্রিটিশ ড্রাগ অ্যাক্ট, ১৯৪০-এ বাবা রামদেবের বিরোধিতার জন্য একটি আইনি ফ্যাকরা খুঁজে পেয়েছে। এটাই নেহরু ১৯৫৪ সালে ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট নামে চালু করেন। যে রোগগুলি ব্রিটিশ চিকিৎসকরা সেই সময়ে চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হতো, ভারতীয় যোগব্যায়াম, আয়ুর্বেদ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি দ্বারা তা নিরাময় করা যেত। চিকিৎসা

বিজ্ঞানের দিক থেকে ব্রিটিশরা ভেবেছিল যে তারা ভারতীয়দের থেকে উচ্চতর। তাই তারা এই রোগগুলিকে নিরাময় অযোগ্য এবং ঐতিহ্যগত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি কুসংস্কার, জাল ও জাদুকরি ওষুধ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে ঘোষণা করেছিল।

কুখ্যাত ইসলামি আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে নালন্দার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেছিল, এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে কোনো মুসলমান হেকিম তাকে সুস্থ করতে পারেনি। নালন্দার আচার্য নাগার্জুনের মেধাবী শিষ্য আচার্য শীলভদ্র ক্ষমতালোভী, বর্বর অনুপ্রবেশকারীর আশ্চর্যজনক চিকিৎসা করেছিলেন। কৃতজ্ঞতা দেখানোর পরিবর্তে খিলজি সবাইকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়েছিল। সমস্ত শিক্ষক, সন্ন্যাসী এবং ছাত্রদের হত্যা করেছিল, নালন্দার ৬ লক্ষ পাণ্ডুলিপি এবং মূল্যবান পুস্তকে পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল, প্রাচীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার এবং ভবনটিকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। ৬ মাস ধরে সেই আগুন জ্বলেছিল।

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড থেকে হাজার হাজার রোগী ক্যানসার, ছানি, অন্ধত্ব, বধিরতা, দীর্ঘস্থায়ী নিউরো-সাইকিয়াট্রিক সমস্যা, আর্থ্রাইটিস, অটোইমিউনো ডিজিজ ও গাইনোকোলজিকাল রোগের চিকিৎসার জন্য পতঞ্জলি ওয়েলনেস সেন্টার এবং যোগ গ্রাম পরিদর্শন করছেন প্রতি বছর।

বেশিরভাগ রোগী প্রাকৃতিক চিকিৎসা, খাদ্যতালিকাগত সমন্বয়, বিভিন্ন যোগব্যায়াম ভঙ্গি এবং অনুলোম-বিলোম প্রাণায়ামের জোরে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সুখ অনুভব করেছেন। অনেক ধরনের আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি, যেমন পঞ্চকর্ম, কাশয়াবস্তী (ওষুধযুক্ত এনিমা) এবং বিভিন্ন ধরনের বডি ম্যাসাজ, ভেষজ ওষুধ ছাড়াও, দীর্ঘস্থায়ী রোগের নিরাময় করে।

প্রাণায়াম হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের একটি সমকালীন ক্রিয়াকলাপ। প্রাণায়ামে ধীর, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস মনকে শিথিল করে এবং হাঁপানির মতো অনেক ফুসফুসের রোগের উপসর্গ কমায়। প্রাণায়াম শ্বাসনালী নিঃসরণ পরিষ্কার করতে পারে এবং ফুসফুসের স্বাভাবিকতা বাড়াতে পারে। এটা শ্বাসের সময় শ্বাসযন্ত্রের পেশীর কার্যকারিতা বাড়াতে পারে, এই ভাবে তাদের শক্তিশালী করে এবং রক্তের অক্সিজেন স্যাচুরেশন বাড়ায়। নিয়মিত প্রাণায়াম অনুশীলন আবেগাত্মক প্রবণতা কমিয়ে এবং স্ট্রেস হরমোন, যেমন ক্যাটেকোলামাইন এবং কর্টিসল হ্রাস করে উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

প্রাণায়াম মানসিক শক্তি, স্মৃতিশক্তি, সচেতনতা, মনোযোগ ও একাগ্রতাকেও উন্নত করতে পারে, যা পশ্চিমি গবেষকরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন। এটি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপগুলি, বিশেষত অ্যামিগডালা, অ্যান্টিরিয়র সিঙ্গুলেট, ইনসুলা ও প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের কাজগুলিকে সংশোধন করে এবং এইভাবে মস্তিষ্কের মানসিক ও মেজাজ বা মুড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলির কার্যকারিতা মসৃণ ও উন্নত করতে পারে, যার অর্থ হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে কাজ করে এবং হার্টের উপর চাপ কম হয়। যাদের হৃদস্পন্দন কম থাকত তারা প্রাচীনকালের যোগীদের মতো সবাই শতায়ু ছিলেন।

১৭০৪ সালে ইতালীয় চিকিৎসক আন্তোনিও ভালসালভা শ্বাস ধরে রাখার বিষয়গুলি বর্ণনা করেছিলেন যা মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন এবং শ্বাসের হার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারাসিমপ্যাথেটিক এবং আবেগমূলক স্নায়ুর কাজ ত্বরান্বিত করতে সক্ষম। ভারতের যোগীরা গত ৫০০০ বছর ধরে এই পদ্ধতিটি জানতেন এবং সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে কয়েক মাস ধরে একত্রে রাখতে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম বা স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমাদের খালি চোখে আমরা শুধুমাত্র ৫০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে পাই। ৭০০ ন্যানোমিটারের উপরে যাকে বলা হয় ইনফ্রারেড বা ৪০০ ন্যানোমিটারের কম যাকে অতিবেগুনি রশ্মি বলা হয়, যা আমরা দেখতে অক্ষম। এর মানে মানুষের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সীমিত। আমরা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ জিনিসগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না। একইভাবে আয়ুর্বেদ ও যোগব্যায়াম আশ্চর্যজনক কাজগুলি করছে যা আমরা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু এর মানে এই নয় যে সেগুলি সবই মিথ্যা!

ডায়াবেটিস মেলিটাস— ১ ও ২, মাসিক অনিয়ম, মানসিক সমস্যা, স্নায়বিক ব্যাধি যেমন মাইগ্রেন, খিঁচুনি ও পেশী দুর্বলতার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের ভেষজ ওষুধ, যোগাসন ও প্রাণায়ামের সূক্ষ্ম অনুশীলনের চিকিৎসার মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে উন্নতি হয়েছে পতঞ্জলি ওয়েলনেস সেন্টারে।

কিডনি বা গলব্লাডারে পাথরের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি, প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং যোগব্যায়াম দ্বারা নিরাময় করা যেতে পারে। পতঞ্জলিতে অন্ধত্ব ও গ্লুকোমার মতো চোখের বিভিন্ন রোগের সফলভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে। পতঞ্জলি ওয়েলনেস সেন্টারে দীর্ঘমেয়াদি পুরুষ ও মহিলা বন্ধ্যাত্বের সফল চিকিৎসাও করা হয়েছে। □

*With Best Compliments from -*

**A Well wisher**

# মা-মাটি-মানুষের রাজ্যে শুধুই ধ্বংসলীলা আর মানুষের হাহাকার

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

কয়েকদিন আগে কলকাতার গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়েছে একটি ছ'তলার বহুতল। বেআইনিভাবে তৈরি করা বাড়িটি ভেঙে পড়েছে পাশেই গা ঘেঁষে থাকা টালির চাল দেওয়া বাড়িগুলির ওপর। তাতেই মারা গিয়েছেন বেশ কয়েকজন মানুষ। এইরকম বেআইনি নির্মাণ শুধু কলকাতাতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন শহরে নির্মিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তা ভেঙেও পড়েছে। গার্ডেনরিচ কাণ্ডে ভেঙে পড়া বহুতলের ধ্বংসস্তূপে তখন উদ্ধার কাজ চলছে, তারই মধ্যে জানা গেছে হুগলির বৈদ্যবাটিতে গত ১৯ মার্চ, মঙ্গলবার দুপুরে ভেঙে পড়েছে একটি বাড়ির কিছু অংশ। সেখানে জখম হয়েছেন দু'জন। বিভিন্ন শহরে এরকম বেআইনি নির্মাণ রুখতে সারাদেশে পুরসভাগুলির কড়া আইন থাকলেও তা শুধু খাতা-কলমেই থেকে যায়। নজরদারির অভাবে, অর্থের জোরে এবং রাজনৈতিক প্রভাবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেআইনি নির্মাণের কাজ চলতেই থাকে।

জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্বীকার করেছেন, ভেঙে পড়া বহুতলটি বেআইনি নির্মাণ ছিল। স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতা পুরসভা কি তাহলে আগে থেকে জানত না? দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে বহুতলটি তৈরি হচ্ছিল অথচ পুরসভার কাছে কোনও খবর ছিল না? যদি খবর পেয়ে থাকে তাহলে তারা শাসন ক্ষমতায় থেকে কোন কাজটি করছিলেন?

গার্ডেনরিচের ঘটনায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেছেন, 'মৃত্যুমিছিল চলছে। সত্যি যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিকতা বোধ থাকত,

তাহলে এখনই ওখানকার মেয়রকে তাড়িয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করার দরকার ছিল। এই যে মানুষগুলোর মৃত্যু হয়েছে তার জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন, তাঁর নাম মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এতবড়ো অভিযোগ করছি আমি। ভদ্রতা থাকলে, নৈতিকতা থাকলে ফিরহাদ হাকিমের এখনই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। আর মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল ঘাড় ধরে মেয়রকে পদ থেকে নামিয়ে জেলে ভরে দেওয়া।'

কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনিভাবে পাকাবাড়ি, মসজিদ এবং ছোটো ছোটো ঝুপড়ি শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে তৈরি হয়েছে বিগত বাম সরকারের আমলে। আর বর্তমান সরকারের আমলে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ঝড়ের গতিতে বহুগুণে। ওইসব এলাকায় দেশের আইনের কোনো মূল্য নেই, নেই প্রশাসনের কোনো আইন প্রয়োগের ক্ষমতা। কেননা সরকার যদি নিজে থেকেই এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তাহলে পুলিশ বা প্রশাসনের করণীয় আর কীই-বা থাকে। কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত মুসলমান এবং অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতে বহু 'মিনি পাকিস্তান' সৃষ্টি হয়েছে। সেইসব এলাকায় প্রশাসন সবসময় নিষ্ক্রিয় থাকে ভোটের স্বার্থে। তাই তাদের এত দাপট। কয়েক বছর আগে হোয়াটস্অ্যাপে একটা লেখা পড়ে তা সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। সেই লেখাটা পড়লে একদিকে যেমন কলকাতার মিনি পাকিস্তানের বাস্তব চিত্র জানা যাবে, তেমনি শীতল রক্তের স্রোত বইয়ে যাবে শরীরের শিরায় শিরায়। এবারে দেখে নেওয়া যাক সেই বর্ণনা—

'বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে মোমিনপুর, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, পার্ক সার্কাস, মৌলালি, শিয়ালদা, রাজাবাজার, বন্ডেলগেট-কুসতিয়া প্রভৃতি কলকাতা শহরের মধ্যে আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো ইসলামিক শহর। এইসব এলাকায় কখনই সরকারি নিয়মনীতি মানা হয় না বা যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা কেউ তাদেরকে সরকারি নিয়ম মানতে বাধ্য করে না। কারণ তাহলে ভোটে টান পড়বে। ফিরহাদ হাকিম যেগুলোকে গর্ব করে বলেছিলেন— 'মিনি পাকিস্তান।' এইসব এলাকায় গায়ে গায়ে ৫-৬ তলা বেআইনি বাড়ি। ফাঁকে ফাঁকে ছোটোবড়ো মসজিদ। মসজিদের সামনে গোরু জবাই করার জন্য কর্পোরেশন থেকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেওয়া বড়ো বড়ো সিমেন্টের চাতাল। সরু সরু গলি, লক্ষ লক্ষ লোক। বেশিরভাগই অশিক্ষিত, অমার্জিত মারমুখী উত্তরপ্রদেশ, বিহারি মুসলমানদের দল। ২৪ ঘণ্টা মাথায় টুপি, গায়ে বোঁটকা গন্ধ। মহিলারা সারাদিন বোরখা পরা। এক একটি পরিবারে অন্তত ১০-১২ জন সদস্য। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে, পুতিগন্ধময়। ঘরের ভিতর সারাদিন লাইট জ্বলছে। হুকিং করে কারেন্ট, ২৪ ঘণ্টা কলে পুরসভার মোটা জল। এসব এলাকায় কোনোদিন লোডশেডিং হয় না। প্রায় প্রতিটি বিল্ডিঙের ভিতর একটা করে ছোটো কারখানা— প্লাস্টিক, জামাকাপড়, নামি কোম্পানির নকল দ্রব্য ইত্যাদি। প্রতিটি গলির মুখে ২-৩টি গোরুর মাংসর দোকান— মাছি বসা, বাসি, হলদে হয়ে যাওয়া গোরুর শরীরের ছোটো বড়ো কাটা টুকরো ঝুলছে। প্রতিটি গলির ভিতরে ২-৩টি পরোটা ও কসা গোরুর মাংসের দোকান। পেঁয়াজ, রসুন, পোড়াতেল, গরম মশলা ও নর্দমার গন্ধ মিশে এক অবর্ণনীয় পরিবেশ। মাঝে মাঝে একটা ছোটো ক্লাব, ওদের ভাষায় 'দহলিজ' বা 'দলিজ'। প্রতি পাড়ায় একটা করে প্রাথমিক ইসলামিক স্কুল— বাচ্চারা টুপি মাথায় দিয়ে বা হিজাব পরে দুলে দুলে কোরান হাদিস পড়ছে।

এলাকাগুলিতে ভোর চারটে থেকে রাত ১টা অবধি হইচই, চেঁচামেচি, গালাগালি, মাছের বাজার লেগে থাকে। মাঝে মাঝেই এর ওর বাচ্চা হারিয়ে যায়। তখন মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হয়, লোকে খুঁজে দেয়। সারাদিন শয়ে শয়ে লোক ঢুকছে-বেরুচ্ছে। কে আসছে, কে যাচ্ছে, কে কোথায় থাকে, কে কী করে, কেউ খবর রাখে না, এমনকী সরকারও নয়। দেশি-বিদেশি উগ্রপন্থীদের নিরাপদে লুকিয়ে থেকে নাশকতামূলক কাজকর্ম করার আদর্শ পরিবেশ। মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের লোকদের এসব এলাকার ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। এমনকী পুলিশও ঢোকে না। যাকে বলে No Go Zone।

শিক্ষিত কালচার্ড, রঙিন পাঞ্জাবি পরা ও মিহিগলায় পণ্ডিতি ফলানো ছক্কা বাঙ্গালি, এসব এলাকায় গেছো কখনো? খুঁটিয়ে দেখেছ এখানকার জীবনযাত্রা? আমি দেখেছি এবং দেখে শিউরে উঠেছি। প্রতিটি এলাকায় লুকানো প্রচুর বেআইনি রিভলবার, পিস্তল, তরোয়াল। এছাড়া হাতে বানানো পেটো থেকে শক্তিশালী গ্রেনেড— সব আছে। সরকারের কাছে সব খবর আছে, কিন্তু সরকার জেনেও না জানার ভান করে আছে। কারণ ভোটব্যাংক। একদিন এই প্রত্যেকটা মিনি পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ জিহাদি শয়ে শয়ে অস্ত্রহাতে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে কলকাতার বুকে--- দুর্বল-ভীতু-স্বার্থপর-সবজান্তা-উদার-সেকুলার বাঙ্গালির ওপর। শুরু হবে আরেক CALCUTTA KILLINGS!

সেদিন বেশি দূরে নেই। সেদিন কিন্তু কোনো মমতা, 'সূর্যকান্ত বা মোদীর দাদুও বাঙ্গালিকে বাঁচাতে পারবে না।'

হোয়াটস অ্যাপের বর্ণনা সামনে রেখে বলতে ইচ্ছে করছে--- পূর্বপুরুষদের জন্মভিটে থেকে মানসম্ভ্রম, সম্পদ খুইয়ে একবস্ত্রে পালিয়ে আসা কিছু বাঙ্গালি এবং এই বঙ্গের স্থায়ী কিছু হিন্দু রাজনীতিক যারা এই পশ্চিমবঙ্গে বসে এই রাজ্যকেই পুনরায় জিহাদিদের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর, তারা সেদিন পালিয়ে আবার কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন? সেদিন ও কিন্তু ১৯৪৬ সালের মতো জেহাদিরা আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ১৯৪৬ সালে কলকাতাকে রক্ষা করেছিলেন সেই গোপাল মুখার্জীও আজ নেই, নেই সেই তরুণদলও। তাই বর্তমান সেকুলার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের উদ্দেশে ছোট্ট প্রশ্ন রাখতে চাই— আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপনারা কোন পশ্চিমবঙ্গ রেখে যেতে চাইছেন? □

# উদ্বাস্তু ভাবাবেগে ভর করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল

**ড. রুবি সাঁই**

দেশভাগের ফলে প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গে আসেন তারা কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও, ১৯৫২-১৯৬৫ সালের মধ্যে যে সমস্ত বাঙ্গালি মুসলমানদের অত্যাচারে সেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রাদয়ভুক্ত। এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিলেন হতদরিদ্র, অনগ্রসর এবং শিক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর। তারা মূলত পরে আসার কারণে অসংখ্য মানুষকে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন না দিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিশেষত আন্দামান এবং মধ্যপ্রদেশ-ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন দণ্ডকারণ্যে পাঠায়। ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার রাজ্য হওয়ায় পানীয় জলের অভাব এবং পাথুরে মাটি কৃষি কাজের অনুপযোগী হওয়ায় দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজি ছিলেন না তারা, তবুও অসংখ্য মানুষ দণ্ডকারণ্যে জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার লড়াই শুরু করেন যার ফলে ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া-সহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়।

১৯৪৭ সালে রায়পুরের মানা ক্যাম্পে C.R.P.F জওয়ানরা গুলি চালায় তাতে কয়েকজন মারা যান ও অনেকে আহত হন। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই সমস্ত উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষদের কথা মনে পড়ে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। বামপন্থী দলগুলি এই উদ্বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বামপন্থীদের প্রধান দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে সমস্ত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু রয়েছে, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা পরিবেষ্টিত পরিবেশে পুনর্বাসন দিতে হবে। তারা পুনর্বাসনের জন্য সুন্দরবন সংলগ্ন জল-জঙ্গল ঘেরা জনবিরল এলাকা চিহ্নিত করে। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু-সহ অন্যান্যরা দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে ভ্রমণ করেন এবং প্রচার চালান পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। বাম নেতৃত্বের এই আশ্বাস এই সমস্ত হতদরিদ্র, ছিন্নমূল মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে বাঁচবার প্রেরণা ও ভাবাবেগকে সন্তুষ্টি প্রদান করেছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে।

উদ্বাস্তু ভোটব্যাংকের উপর নির্ভর করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসে এবং মুখ্যমন্ত্রী হন সিপিআইএম নেতা জ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদল দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের মনে আনন্দের জোয়ার আনে তা কেবলমাত্র নিজেদের সংস্কৃতি ঘেঁষা পরিবেশে বাঁচার আশায়। উল্লেখ্য, জ্যোতি বসুর জন্মের আগেই বসু পরিবার পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে (যেখানে ঠাকুর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম অবস্থিত) বাস করতেন এবং সেখানে তাদের জমিদারি ছিল। জ্যোতি বসু পূর্ববঙ্গের মানুষ হয়েও পশ্চিমবঙ্গে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হন। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের উপর তিনি সহৃদয় থাকবেন এমনটা স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

**উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিচারিতা :**

ক্ষমতায় আসার আগে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ঘেঁষা পরিবেশে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট সরকারকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে অনেকটা সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে দণ্ডকারণ্য থেকে অসংখ্য উদ্বাস্তু ১৯৭৭ সালের পর থেকে বামপন্থী দলগুলির পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজেদের ঘটিবাটি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের আশায় যাত্রা শুরু করে। তাদের স্লোগান ছিল 'চল কলকাতা, চল সুন্দরবন'। তারা এও মনে করেছিল যে দণ্ডকারণ্যে অপরিচিত ভাষা, সংস্কৃতি এবং সেনার গুলিতে প্রাণ হারানোর চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বাঘের পেটে গিয়ে মরা ভালো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে তারা তা ভুলে যায় অসংখ্য উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষের স্রোতে পশ্চিমবঙ্গের সাজানো বাগানে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা অসংখ্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। যা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, এমন চিন্তাধারা দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের স্বপ্নকে পুনরায় দুঃস্বপ্নে পরিণত করল।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রেল স্টেশনে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জোর করে ফিরতি ট্রেনে অমানবিকভাবে ফেরত পাঠাতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও অসংখ্য মানুষ পুলিশ প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ট্রেনলাইন দিয়ে হাঁটা পথে পৌঁছে যায় পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপি দ্বীপে। মরিচঝাঁপির আশেপাশের দ্বীপ ও গ্রামগুলি সাতজেলিয়া, কুমিরমারি, ঝড়খালি, ছোট মোল্লাখালি ইত্যাদিতে বহুদিন

ধরে নমঃশূদ্রদের বাসস্থান। ১৯৩০ সাল থেকে ব্রিটিশরা সুন্দরবনের কিছু অংশে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা থেকে নমঃশূদ্রদের নিয়ে এসেছিল, আর সাথে ছিল স্থানীয় মুণ্ডা ও সাঁওতাল অধিবাসী। দণ্ডকারণ্য থেকে আগত নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মরিচঝাঁপির পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের সঙ্গে ছিল পুরনো রক্তের টান এবং একে অপরের আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর ছিল একই সংস্কৃতি ও ভাষা পরিবেষ্টিত পরিবেশ ও প্রান্তিক অবস্থান। এই পূর্ব পরিচিতি ও সহমর্মিতার কারণে স্থানীয় উদ্বাস্তুদের সহযোগিতায় দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপির বসবাস অনুপযুক্ত পরিবেশকে নিজেদের শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে থাকে, প্রথমে তারা নারকেল ও ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে গড়ে তোলেন অস্থায়ী খড়ের ছাউনি দেওয়া বাসস্থান।

অশেপাশের বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তারা শিখে যান কাঁকড়া ধরা, মাছ ধরা, ছোট বাঁধ দিয়ে নোনা জল আটকানোর পদ্ধতি। চাষাবাদের জন্য ১২৫ বর্গমাইল মরিচঝাঁপি প্রায় ৩০ হাজার দণ্ডকারণ্য থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পক্ষে বাঁচার অনেকটা স্বপ্ন দেখিয়েছে, যার ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অনেক উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপিতে এসে বসবাস শুরু করেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী এই উদ্বাস্তুরা কোনোরকম সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া মরিচঝাঁপিকে অতি দ্রুত বসবাসের উপযোগী করতে অনেকটা সফল হন। নিজেদের উদ্যোগে স্কুল তৈরি করা, নৌকার লাইসেন্স পাওয়া, পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল বসানো, মাছের ভেড়ি, নুনের আড়ত, এমনকী গড়ে উঠল ডিসপেন্সারি এবং ছোটদের জন্য প্রাথমিক স্কুল। বেঁচে থাকার এই উদ্যোগ উদ্বাস্তুদের একান্তই নিজেদের প্রয়াস এবং নিজেদের পয়সায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের কিছু সচেতন নাগরিক যেমন গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রমুখের উদ্যোগে সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের জলসা বসিয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির হাতে। মরিচঝাঁপিতে বসবাস করা উদ্বাস্তুদের আশা ছিল, সুন্দরবনের নোনাজল ও বন্য হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যোগের ফলে বসবাসের অনুপযুক্ত পরিবেশে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামের বিষয়টি বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে বিচার করবে এবং ন্যূনতম বসতির অনুমতিটা প্রদান করবে।

বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে কীভাবে দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের ভোটে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের বিধানসভার কয়েকটি আসন জয়লাভ করবে তার স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি এমন দ্বিচারিতার কারণে উদ্বাস্তু সমিতিগুলি সিপিআইএম-কে সমর্থন করতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের চরম আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে যে সকল উদ্বাস্তু বসতি শুরু করেছে তাদের ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিচারিতা ও মানবতা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। বামফ্রন্ট নেতৃত্ব মনে করেছিল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঙ্গে আগমন ঘটলে সরকারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়বে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে, যা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে ও টিকিয়ে রাখতে সমস্যা তৈরি করবে। তৎকালীন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্দেশখালির ১৪টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টিতে আরএসপি জয়লাভ করে। জ্যোতি বসু মনে করেছিলেন এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে থাকতে দিলে সিপিআইএম-এর পরিবর্তে তাদের শরিক দল আরএসপি-র প্রভাব বাড়বে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের পার্টির অবস্থানকে প্রশাসনিকভাবে কার্যকরী করতে হতদরিদ্র, ছিন্নমূল মানুষদের জীবন ও সংগ্রাম এবং নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের Reserve Forest Act-এর আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে বেআইনি বসবাসকারী আখ্যা দেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেন। তাদের বক্তব্য হলো সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে অসংখ্য উদ্বাস্তু প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করে বসতি স্থাপন করেছে, যা সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করেছে। তাদের এখনই উৎখাত না করা গেলে তা রক্ষা করা যাবে না। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বৈচিত্র্যপূর্ণ দ্বিচারিতায় উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসন তো দূরের কথা বরং নিজেদের সুপ্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধিকে সূক্ষ্মভাবে বাস্তবায়নের কারণে এবং নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় পূর্বপরিকল্পনা ও মানবতার সকল সীমা লঙ্ঘনকারী এক ঘটনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে ১৯৭৯ সালের মরিচ ঝাঁপি গণহত্যা সংঘটিত করে। □

# মাতৃভূমি, মাতৃশক্তি, মাতৃচেতনা

**শেখর সেনগুপ্ত**

বিরুদ্ধ মত সমেত প্রতিবাদী কিংবা তথাকথিত কোনও আধুনিক যুক্তিবাদী আমাকে অন্যরকম বোঝাতে চাইলেও আমার সেই এক কথা,— হিন্দুধর্মে আশ্রিত আমি আজও অখণ্ড ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি বলেই মনে করি। ঐতিহাসিক অনাচার, চক্র-চক্রান্ত কয়েক কোটি নর-নারী সমেত আমাকেও নিতান্ত শিশু বয়সে বাধ্য করেছে মুখ্যত হিন্দুত্বে সমৃদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষের একটি অংশ ত্যাগ করতে। অন্য এক অংশে গিয়ে আশ্রয় নিতে এবং সেখানেই জীবনের শেষাংশে পৌঁছে যেতে যথাকালে। হিন্দুত্বই আমাকে শিখিয়েছে মানবিকতা কাকে বলে। সেই বেদ-বেদান্ত, গীতা, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এই দেশের মনীষা কখনও অপরের দুঃখ-বেদনায় বেদনার্ত হবার পরিবর্তে সোল্লাসে ফেটে পড়েনি। ইতিহাসের ছাত্র হয়েই আজও আমি মিথ্যাচার ও অমানবিক আবর্জনাকে সরিয়ে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বেড়াই। হিপোক্র্যাটের মতো অন্য ধর্মের মানুষকে অবজ্ঞা করি না, সন্দিগ্ধচিত্তে ঝটিতি তাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করাকে অনুচিত বলেই মনে করি। নিছক দেঁতোহাসিকে সরিয়ে রাখতে পেরেছি মার্জিত আচরণের মাধ্যমে। কিন্তু যা সত্য নয় এবং মানহানি ঘটায়, তাদের প্রতি প্রায় নীরবে দৃষ্টি আমার ক্রমেই খর হয়ে ওঠে। রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল যবে, সেই পর্বকে মাথায় রেখে অনুধাবনের চেষ্টা করি, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ হয়েছিল ঠিক কোন সময়ে। এটা নির্ধারণ করতে আমাকে যুগপৎ ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদদের গ্রন্থাদির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে একেবারে নিরুপায় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইনি।

রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল যবে, সেই পর্বকে ছুঁয়ে চলে যেতে হয়েছে মহাভারতীয় পর্বে। তবুও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে ঠিক কোন সময়ে রক্তপ্রবাহ বইয়ে দেয় স্বজনদের, তার সঠিক নির্ণয় করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের অপেক্ষা জ্যোতির্বিদদের ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়েছে। এখানেও বিভ্রাট এড়াতে যুক্তিতর্ক চলছে যুগের পর যুগ। একদল পুরাণ ব্যাখ্যাদাররা বলছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল যিশুর জন্মের ৩১০২ বছর আগে, তখন অন্য কয়েকজন বিদ্বানের অভিমত, ওই মহারণ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দে। তবে সেই যুদ্ধ যে ঘটেছিল, এই বিষয়ে দ্বিমত নেই। আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা বিখ্যাত গবেষণাসিদ্ধ রচনা 'কৃষ্ণচরিত্র'তে জানালেন, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটে যিশুখ্রিষ্ট জন্মাবার দু' হাজার চারশো ঊনপঞ্চাশ বছর আগে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আমরা যতসব শিলালিপি পেয়েছি, আজ অবধি তাদের বিন্দুবিসর্গেরও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। কেবল কাব্য ও অনুমানের দ্বারা ইতিহাসকে নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব নয়।

রাজা ভরতের নামানুসারে উচ্চারিত দেশ ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে গ্রিক হানাদারদের দ্বারা 'ইন্ডিয়া' নামেও পরিচিতি লাভ করে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের আগে পারস্যের হানাদাররা মাঝে মাঝেই এই দেশকে আক্রমণ করেছে। তখনই ভারতের সপ্তসিন্ধুর নামানুসারে এই দেশে বসবাসকারী সকলেরই নাম হয়ে যায় 'হিন্দু'। আদি পর্ব থেকেই এ দেশের মানুষ পূজা করে এসেছেন শিব, দুর্গা, গণেশ প্রমুখ দেব-দেবীকে। চোয়াল ঝুলিয়ে যাঁরা এই তথ্যকে অস্বীকার করেন, তাঁরা সঠিক পন্থায় ও সততার সঙ্গে ইতিহাস চর্চায় অসমর্থ। অন্তত ইতিহাসের মধ্যযুগ অতিক্রম না করা অবধি ভারতবাসী মুখ্যত হিন্দুরূপেই পরিচিত ছিলেন। ইন্দাস বা সিন্ধুনদের নামানুসারে হিন্দুদের এই বাসভূমিকে 'ইন্ডিয়া' নামে অভিহিত করতে শুরু করে হানাদার গ্রিকরা। তারা কিন্তু ভারতীয়দের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে নষ্ট করবার চেষ্টা করেনি। দেব-দেবীর প্রধান্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তৎকালীন ভিনদেশীয়রাই ভারতবর্ষকে চারটি ভাগে ভাগ করে— (১) সিন্ধু-গঙ্গা বিধৌত উত্তরাঞ্চল, (২) পশ্চিমে প্রতীচ্য, (৩) পূর্বে প্রাচ্য এবং (৪) দক্ষিণে দক্ষিণাপথ।

এই চারি ভুবনের মিলনে গঠিত হয়েছিল অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য ভারতভূমি,— যাদের মিলন, ঐক্য, সাদৃশ্য নিয়েই আমার-আপনার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ, যেখানে মিলনের মুখ্য সেতু ছিল হিন্দুধর্ম,— যে মিলনকে জাগ্রত করা আজ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠুক। এটা খুব দরকার। ত্রিকোণাকৃতি এই দেশের অখণ্ড রূপ আজও কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন ও নীরব সাধনা। ধর্মভিত্তিক দেশ-বিভাজন তো আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম তো প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষে একটাই এবং তা হলো হিন্দুধর্ম। অন্যান্য ধর্মগুলিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক খেলায়, যেখানে বিবেক ও ঐতিহ্য দুটোকেই ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রাখার নোংরা প্রয়াস অব্যাহত। আমি যখনই কোনও ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব লোকের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি, বিবিধ হাবিজাবি ডিমেনাশিয়াতে আক্রান্ত ক্ষিপ্ত লোকের মতো তিনি পিছু হটেছেন। ঢুকে পড়েছেন বেইমানির খাঁচায়, যা কোনও কালেই নিষ্কলুষ নয়। আসুন, আমরা আমাদের এই দুরপনেয় দুর্বলতাকে মুছে ফেলি। ইতর প্রাণীদেরও সহবত শেখাবার চেষ্টা করি। হিন্দুত্বের অমেয় বন্ধনে টেনে আনি তাঁদেরও, যাঁরা বিভ্রান্তিহেতু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দূরত্বকে মুছে ফেলতেই হবে ভিনদেশি তত্ত্বের বদলে নিজেদের শত শত বছরব্যাপী জীবন্ত শিখা ও আদর্শকে মাথায় তুলে নিয়ে। □

# রাষ্ট্রবাদী প্রার্থীদের মনোবল বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী

গত ২৬ ও ২৭ মার্চ বসিরহাট ও কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রেখা পাত্র ও অমৃতা রায়কে ফোন করে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সঙ্গে দুই প্রার্থীর কথোপকথনের অডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। সন্দেশখালির শক্তিস্বরূপা রেখাদির লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। প্রধানমন্ত্রীও বঙ্গের নারীশক্তির এই জাগরণের উল্লেখ করে রেখাদির ভূমিকার প্রশংসা করেন। বসিরহাট কেন্দ্রে রাজ্যের শাসক দলের তরফে দাঁড়ানো মাফিয়া, জেহাদি প্রার্থীর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে রেখাদির সাফল্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। কোনো পরিস্থিতিতেই ভেঙে না পড়ে নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়িয়ে জেহাদিদের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধে দৃঢ় থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন রেখাদিও।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কুলবধূ কৃষ্ণনগরের রানিমা শ্রীমতী অমৃতা রায়কে পরের দিন ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গভূমির সম্মান এবং সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপে রানিমা এক শ্রেণীর অনুপ্রাণিত মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবিরোধী, চরিত্রহীন, আঁতেলদের তৈরি অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দেন। রানিমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে প্রধানমন্ত্রীও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অবদানের উল্লেখ করেন এবং নিজেদের পছন্দমতো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এই ধূর্ত আঁতেলদের সুবিধাবাদী, চতুর কৌশল থেকে সবাইকে সজাগ থাকতে বলেন। জয়যুক্ত হলে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে উন্নয়নযজ্ঞের লক্ষ্যে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যক্রমের সূচি তৈরির অনুরোধ রানিমাকে করেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণনগর কেন্দ্র জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প সমূহের রূপায়ণের উদ্দেশ্যে তিনি ও রানিমা একযোগে কাজ করবেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

দেশ জুড়ে প্রাক-নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর তরফে পশ্চিমবঙ্গের এই দু'জন মহিলা প্রার্থীকে ফোন করা, তাঁর তরফে নির্বাচনী প্রচারে সর্বতোভাবে তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাসের অডিয়ো বার্তা যেন দশটি জনসভার কার্যকারিতার সমান। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা প্রকাশও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বসিরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী রেখা পাত্র একজন প্রতিবাদী ছাড়াও একজন জাতীয়তাবাদী মানুষ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নির্যাতিতার প্রতিবাদের প্রতীক। নারীশক্তির জাগরণের ভাষা হলেন অগ্নিকন্যা রেখাদিদি। শাসকের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসা নারীরাই সমাজকে নেতৃত্বদানে সক্ষম। তাঁর লড়াই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনীদের। পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, রাজ্যের শাসকের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের জনতাকে একজোট করার লক্ষ্যে শামিল রানিমা অমৃতা রায়ও অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলোকবর্তিকা। আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের আপামর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আশীর্বাদ তাঁরা পাবেন এই আশা আমরা সবাই করি।

—**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,**
খড়দহ।

# আত্মনির্ভরশীল ভারত গঠনে চাই মোদী সরকার

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে পরিচিত। স্বাধীনতার আগে দেশটি ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ফলে দেশটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়। ভারতমাতার মহান সন্তানেরা যে উদ্দেশ্যে আত্মবলিদান দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন, বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বরং কংগ্রেস সরকারের আমলে দেশ দুর্নীতি আর আর্থিক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। কর্মসংস্থানের বদলে ভাতা, ভরতুকি দিয়ে মানুষকে হাতে রাখতে চেয়েছিল। একদিকে মানুষ পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে দেশ ঋণের জালে জড়িয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই নীতিতেই চলছে। কারণ কংগ্রেসের গর্ভে তৃণমূলের জন্ম। তাই ভারতবর্ষের মানুষ ২০১৪ সাল থেকে এমন এক দেশ নেতাকে নির্বাচন করছেন, যিনি দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। বিশ্বের দরবারে ভারতের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। ভাতা, ভিক্ষার বদলে আত্মনির্ভরশীল ভারত গঠনে উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিগত দশ বছর মোদী সরকার সাধারণ মানুষের জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে , কৃষকদের সাহায্যের জন্য কৃষক সম্মান নিধি, গরিব মানুষের মাথার উপর ছাদ, ১০০ দিনের কাজ, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও এইরকম বহু জনমুখী প্রকল্প চালু করেছে। আর এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে রাজ্য সরকার অনেক প্রকল্পকে নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অনেক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্র সরকার কিছু প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে রেখেছে। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচন দেশের মানুষের কাছে এক কঠিন পরীক্ষা। একদিকে সুবিধাবাদী, পরিবার তান্ত্রিক, দুর্নীতি পরায়ণ নেতা-নেত্রী যারা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, স্বপ্ন দেখিয়ে দেশটাকে লুটে নিতে চায়। অন্যদিকে ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ও দাড়িওয়ালা যোগীপুরুষ সমস্ত দুর্নীতি খতম করে সাধারণ মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। সাধারণ

মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চান। ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে এই ভাবনাকে সফল করতে চান। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আবেদন আত্মনির্ভরশীল, শক্তিশালী দেশ গঠনের জন্য আপনার ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। মোদী সরকারের হাত শক্ত করুন। গোটা বিশ্বের কাছে শক্তিশালী গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত গড়ে তুলুন।

**—চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

# কী চাইছে মোদী বিরোধীরা?

১৯ এপ্রিল প্রথম দফা লোকসভা ভোট। মোট ৭ দফা ভোট। ফল প্রকাশ ৪ জুন। মোদী বিরোধীরা অস্ত্র শানাচ্ছে। তাদের অনেক অভিযোগ। সব শেয়ালের এক রা। ওরা জোর করে মানুষকে নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ভুল বোঝাতে চাইছে যে 'দেশের প্রধানমন্ত্রী কতটা স্বৈরাচারী, তিনি দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে নষ্ট করে দিচ্ছেন, দেশের বিরোধী নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআই লাগিয়ে হেনস্থা করছেন, গ্রেপ্তার করছেন। তাই অবিলম্বে এই সরকারের উচ্ছেদ চাই।' জানা দরকার, কারা কারা এই আওয়াজ তুলছে। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী, তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক ব্যানার্জি, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালু যাদব ও তার পুত্র তেজস্বী যাদব, ডিএমকের স্ট্যালিন ও তার পুত্র, এনসিপির শারদ পাওয়ার ও তার কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। আর আছে উদ্ধব ঠাকরে ও তার পুত্র। ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লাহ ও তার বাবা ফারুক আব্দুল্লাহ।

এরা সবাই পরিবারবাদী দল চালায়। এদের ভাবনায় দেশ নেই। এদের ভাবনায় দেশে ভালো নেই। আছে শুধু পরিবারের ভাবনা। এদের লক্ষ্য তাদের পুত্র বা কন্যারা দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হোক। তাই এক্ষেত্রে সবাই একজোট। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক শ্রেণীর সাংবাদিক ও তাদের মালিক পক্ষ। এদের রাগ কংগ্রেস আমলে এরা বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেত। নরেন্দ্র মোদীর সরকার তাদের সেই সুযোগ বন্ধ করেছে।

রাজনীতিতে কালো টাকার জোগান বন্ধ করতে আনা হয়েছিল 'নির্বাচনী বন্ড'। আজ তা নিয়ে শোরগোল। মোট ২০ হাজার কোটি বন্ডের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৬ হাজার কোটি। ২০১৯ সালে বিজেপির লোকসভার সাংসদ ৩০৩ জন। বিজেপির সাংসদ ৫০ শতাংশের বেশি। বাকি ২৪০ জন সাংসদের দলগুলি পেয়েছে ২০ হাজার কোটি— ৬ হাজার কোটি = ১৪ হাজার কোটি টাকা। শুধু মাত্র বিজেপি টাকা পেয়েছে বলে এতো আলোচনা কেন? কংগ্রেস ও তৃণমূল দল প্রায় ১ হাজার ৬ শো কোটি টাকা পেয়েছে। কংগ্রেসের লোকসভায় আছে মাত্র ৯ শতাংশ সাংসদ। তারা কী করে আশা করে বিজেপি ও কংগ্রেসে সমান সংখ্যক বন্ড পাবে? এছাড়া যে রাজ্যে যারা সরকারে আছে তারাই সেখানে বেশি টাকা পেয়েছে বন্ড থেকে।

সরকারে এসে যদি কোনো দল দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তবে সেই সরকারকে বেইমান সরকার বলা যেতে পারে। বিজেপি বিরোধী থাকাকালীন টুজি স্পেকট্রামের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। তাই ২০১১-তে সরকারে আসার পর সারা দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কেন বিরোধীদের মনে হচ্ছে এটা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ? দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডি ৯ বার সমন পাঠানোয় তিনি সাড়া দেননি। উলটে ইডির সমনকে অসাংবিধানিক বলেছেন। ইডি দিল্লি হাইকোর্টকে প্রমাণ দেখানোর পর কেজরিওয়াল হাইকোর্ট থেকে সুবিধা পাননি। ইডি তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এতে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির দোষ কোথায়? বিজেপি কি বলেছে মদ বিক্রিতে দুর্নীতি করতে?

কংগ্রেসের সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী কায়দা করে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৫০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি হজম করে আজ তারা জামিনে আছে। আয়কর দপ্তর হিসাব করে কংগ্রেসের কাছে ১০৫ কোটি টাকার বকেয়া দেখিয়ে বারবার দাবি করেছে। কংগ্রেস তাতে কর্ণপাত করেনি।

সিবিডিটির নিয়ম আছে যে, কেউ আয়করের ডিমান্ড নোটিশ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলে তাকে ডিমান্ডের ২০ শতাংশ টাকা জমা করতে হয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেস তা করেনি। তাই আয়কর দপ্তর কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে তারা ওই খাতায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যালেন্স রেখে অতিরিক্ত টাকা তুলতে পারবে। রাহুল-সোনিয়া খাড়গে মিথ্যা কথা বলছে। তারা বলছে, 'আয়কর দপ্তর তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে।' ওরা সত্যি কথা না বলে মানুষকে ভুল বোঝাতে ব্যস্ত।

আসলে অতি সাধারণ পরিবার থেকে আসা সার্থক, বিশ্ব বরেণ্য নরেন্দ্র মোদীকে সহ্য করতে পারছে না। লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে হিংসা ও কুৎসায় মেতেছে। যে কাজ কংগ্রেস তাদের ৬০ বছরের শাসনে করতে পারেনি তা নরেন্দ্র মোদী তার ১০ বছরের শাসনকালে করে দেখিয়েছেন। তার মধ্যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা ও তিন তালাকের অবসান।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ। সিএএ প্রণয়ন। মজার কথা হচ্ছে, মমতা সমেত বিরোধীরা সিএএ-র বিরোধিতা করছে এই জন্য যে এখানে সব ধর্মের কথা বলা হয়নি। বিশেষ করে মুসলমানদের। একবার ভাবুন সিএএ-তে মুসলমানদের নাম নেই বলে আপত্তি। তাহলে এক দেশ এক আইনেও বিরোধ কেন? সেখানে তো সব ধর্মের জন্য এক আইন চাওয়া হয়েছে। আসলে বিরোধীরা দেশের ভালো চায় না। এরা চায় গণ্ডগোল থাকুক। ওরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে চায়।

**—শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

# ঘর-সংসারে নারীর অবদান

**আনন্দিতা সরকার**

নতুন পরিবেশ, পুরনো অভ্যেসের রদবদল, নতুন দায়িত্ব এসবের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়া, সাংসারিক কাজে অভ্যস্ত হওয়া, এসব কিছুর সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সুখী পরিবার। কথাতেই আছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তাই একটি সংসার সাজিয়ে তুলতে মহিলাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সংসারের নিত্যকর্মকে একঘেয়েমি কাজ ভেবে করলে হবে না। গতানুগতিকতার মাঝেও আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সবই নির্ভর করবে নবদম্পতির উপর। আসলে যত্ন করে সংসারকে সাজিয়ে তোলাও একটা শিল্প। আর সেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের সমাজ মহিলাদের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

**ঘর গেরস্থালি :** বিয়ের পর নতুন সংসার মানে নতুন মানুষের পাশাপাশি বাড়ি-ঘর, পাড়া, দোকান-বাজার সবকিছুরই পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়াটা প্রথম দরকার। কাছে-পিঠে মুদির দোকান, ওষুধের দোকান, খোঁজ নিয়ে নিন। প্রথম দিকে জামা-কাপড়ের হিসাব-নিকেশ রাখাটা সম্ভব নয়। তাই লিখে রাখুন। এছাড়াও ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, কেবল আপারেটরের নাম, ফোন নম্বর এক জায়গায় নোট করে রাখুন। দরকারের সময় সুবিধা হবে।

টেলিফোনে গ্যাস বুক করুন সময়মতো। ভোরের চা দু'জনে বা পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলে তাঁদের সঙ্গে বসে খান। এটা প্রত্যেকদিনের অভ্যেসের মধ্যেই রাখুন। তখন এটুকু মুহূর্তই যেন সবচেয়ে সুখকর মনে হবে।

সকালে উঠে দু'জনকেই একসঙ্গে অফিসে যেতে হবে। তাই আগের দিন রাতেই প্ল্যান করে রাখুন ব্রেকফাস্ট ও অফিস লাঞ্চ। পরদিন কোন পোশাকটা পরবেন সেটাও ভেবে রাখুন। আরও ভালো হয় যদি আগের দিন রাতে দু'জনে মিলে পরের দিনের রান্নার মেনুটা ঠিক করে রাখেন।

**রান্নাবান্না :** বিয়ের পর বেশ কিছুদিন এর বাড়ি ওর বাড়ি নিমন্ত্রণ থাকবে। তারপর কোনওদিন হয়তো বাইরেই রাতের খাবারটা সেরে ফেললেন। কিন্তু এর পর তো আপনাকেই রান্না করতে হবে। আসলে প্রিয় মানুষটাকে নিজে রেঁধে খাওয়ানোর মজাটাই আলাদা। আপনি যদি রন্ধন পটীয়সী হন তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি ভয় পান তাহলে ননস্টিকের বাসনপত্র ব্যবহার করুন। এতে লেগে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়াটা কম হবে। ওভেন থাকলে আরও সুবিধা।

**অন্দরমহল :** সুন্দর করে বাড়ি সাজিয়ে রাখুন। সব কাজ নিজে করতে যাবেন না। ডাস্টিং, কাপড় কাচা, বাসনধোয়া ইত্যাদির দায়িত্ব দিন কাজের লোককে। পার্টটাইম লোক হলে আপনাদের বেরনো এবং বাড়ি ফেরার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে তার আসা-যাওয়ার সময় ঠিক করুন। টপ বারান্দা বা ব্যালকনি কিংবা ঘরের লাগোয়া ছোট বসার জায়গা থাকলে সেখানটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারেন। এখন তো বিভিন্ন নকশাদার মানানসই ফার্নিচার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কিংবা বেশ কিছু অনলাইনেও শপিং করা যাচ্ছে ফার্নিচারের। সে রকম অত্যাধুনিক নকশা করা ছোট বসার টি-টেবিল রাখতে পারেন। সকালে দু'জনে মিলে সেখানে বসে সুগন্ধি চা খেতে মন্দ লাগবে না।

**ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং :** এতদিন মা-বাবা'র ওপরেই এই বিষয়টা ন্যস্ত ছিল। এখন তো আপনার নিজের সংসার। বাড়িতে বড়রা থাকলেও এটা আপনাকেই দেখতে হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী একা থাকেন তা হলে তো কোনওভাবেই কারও থেকে সাহায্য নেওয়াটা সম্ভব নয়। পার্সোনাল ব্যালেন্সশিটও কিন্তু যে কোনও একটা বিজনেসের মতোই। প্রথম থেকেই ঠিকমতো প্ল্যানিংটা জরুরি। আসল কথা হলো শৃঙ্খলা মেনে খরচ করতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ সময়ই সেটা মনে রাখি না। রোজগারের শুরু থেকেই গুছিয়ে আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে পারলে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। কোন খাতে কত খরচ করবেন দু'জনে মিলে একসঙ্গে ঠিক করুন। পিপিএফ, মেডিক্লেম, ফিক্সড ডিপোজিট— এগুলি সবই নির্ভর করবে আপনাদের আয়ের ওপর। বেহিসাবি হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। নিজের বাড়ি না থাকলে ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে ইএমআই হিসাব করে প্ল্যান করুন।

**সপ্তাহের শেষদিন :** রবিবার ছুটি। তাই শনিবার একটু রিল্যাক্সড করতেই পারেন। বাড়িতেই বেশ কিছু ভালো আইটেমের ব্যবস্থা করতে পারেন। নতুন কোনো রেসিপি জেনে থাকলে সেটাই রান্না করে সুন্দর করে পরিবেশন করুন পরিবারের সকলকে।

রবিবার লোক-লৌকিকতা সারতে পারেন। আবার সারা সপ্তাহের ক্লান্তি কাটাতে সেইদিন বাড়িতে রিল্যাক্স করলেও মন্দ নয়। অতএব, নতুন সংসার গুছিয়ে ফেলুন, আনন্দ করুন।

*(সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ)*

# চোখের নানান রোগ-ব্যধি ও চিকিৎসা

**ডাঃ পার্থ চৌধুরী**

ইদানীং সংবাদপত্র, বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রপত্রিকা, রেডিয়ো, টিভি এবং ইউটিউব-এর ভিডিয়োর দৌলতে সাধারণ মানুষের চোখের অসুখবিসুখ সম্পর্কে সচেতনতা অনেক বেড়েছে।

**চোখের রোগের লক্ষণসমূহ :**

(১) এক চোখ বা দুচোখেই দেখতে অসুবিধা—

● হঠাৎ করে দেখতে অসুবিধা (পুরোপুরি বা আংশিক)। ● ধীরে ধীরে কম দেখা (দূরে বা কাছে)। ● রামধনু রং দেখা। ● হঠাৎ আলোর ঝলকানি ও কালো ঝুল বা ঝুলের মতো কিছু দেখা। ● দুটো দেখা বা দ্বি-দৃষ্টি। ● আশেপাশে কম দেখা। ● রাতের দৃষ্টি কম বা রাতকানা। ● রং চেনার অসুবিধা বা বর্ণান্ধতা। ● সবশেষে পুরোপুরি অন্ধত্ব--- এক বা দু'চোখেই।

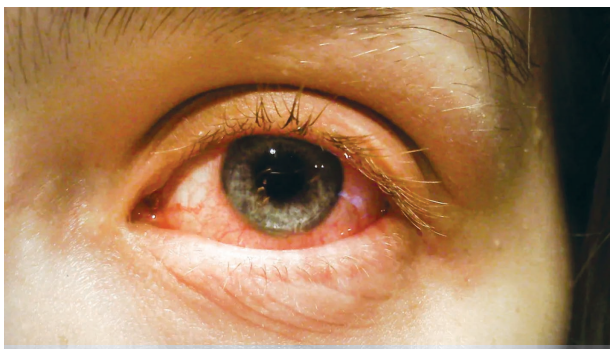

(২) চোখ ব্যথা বা করকর করা।

(৩) চোখ লাল হয়ে যাওয়া (রেড আই)।

(৪) মাথা ধরা-মাথা ব্যথা।

(৫) চোখে জল বা পিচুটি পড়া।

(৬) চোখ চুলকানো।

(৭) আলোতে কষ্ট পাওয়া (ফোটোফোবিয়া)।

(৮) চোখে জ্বালা বা শুষ্ক চোখ (ড্রাই আই)।

(৯) চোখে আঘাত লাগা বা রাসায়নিক পদার্থ ঢুকে যাওয়া।

(১০) অস্বাভাবিক কিছু বা পুরো চোখটাই অস্বাভাবিক দেখা।

চোখে ব্যথা বা করকর করা সামান্য কারণ থেকে বড়ো ধরনের কারণ হতে পারে। চোখে ধুলো-বালি লেগে চোখ করকর করে। আধুনিককালে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের কাজ বেশি করা বা স্মার্ট ফোন ব্যবহার বেশি করা হলে, চোখ করকর করতে পারে। এছাড়া বেশি ব্যথা ও চোখ লাল এবং দৃষ্টি কমে যাওয়া আইরিস বা কর্নিয়ার প্রদাহের কারণে আইরাইটিস ইনফ্ল্যামেটরি গ্লুকোমা বা উভেইটিক গ্লুকোমা হতে পারে। কনজাংটিভাইটিস, চোখের পাওয়ারে অসুবিধা বা চোখের পেশীর দুর্বলতাতেও চোখের ব্যথা হতে পারে।

বিভিন্ন রোগের কারণে চোখ লাল হতে পারে। অনেক সময় কিছু লোকের চোখ একটুতেই লাল হয়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ঘুম না আসা, অনেকক্ষণ ধরে ডিজিটাল ডিভাইসে কাজ করা, মদ্যপান, সিগারেটের ধোঁয়া, স্নান করার পর চোখ লাল হওয়া কোনো গুরুতর ব্যাপার নয়। কিন্তু লাল হওয়ার সঙ্গে চোখের ব্যথা বা জল বা পিচুটি পড়া, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া বা দৃষ্টি কমে যাওয়া বিশেষ বিশেষ চোখের রোগের লক্ষণ।

চোখ চুলকানো একটা পরিচিত সমস্যা। অনেকেরই হয়, আর ইদানীংকালে সেটা অনেক বেড়ে গেছে। অনেক সময় চোখ ঘষতে ঘষতে লাল হয়ে যায়। সাধারণত এটা চোখের বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি থেকে হয়ে থাকে। এছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশের অ্যালার্জিতেও চোখে অ্যালার্জি হয় এবং তার সঙ্গে চোখ চুলকায়। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ 'অ্যালার্জিক কনজাংকটিভাইটিস'। বড়োদের ক্ষেত্রে চোখ চুলকানোর অন্যতম কারণ চোখ শুকিয়ে গেলে 'ড্রাই আই সিনড্রোম'। চোখ যদি অল্প চুলকায় তাহলে চোখের উপর ঠাণ্ডা জলে বা বরফ গলা জলে ভেজানো একটা রুমাল বা কাপড় দিয়ে কিছুক্ষণ চেপে ধরুন। এছাড়া চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারেন, এতে চোখে অনেক আরাম হবে।

চোখ জ্বালা করা চোখের রোগের এক পরিচিত সমস্যা। পেয়াজ কাটার সময় বা লঙ্কাবাটার হাত চোখে স্পর্শ করলে চোখে জ্বালা করে এবং এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু চোখে রোগের ক্ষেত্রে চোখের স্বাভাবিক আর্দ্রতা কমে গেলে অর্থাৎ চোখ শুষ্ক হয়ে গেলেও চোখ জ্বালা করে। একটানা দীর্ঘ সময় কম্পিউটার, ল্যাপটপ ব্যবহার করলে ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘসময় এসিতে কাটালে চোখ জ্বালা করে। এছাড়া চোখে ধুলোবালি পড়লে বা চারপাশের পরিবেশগত কারণে চোখ জ্বালা করতে পারে। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম আই ড্রপ দিলে অনেক আরাম পাওয়া যায়। এছাড়া নিয়ম মেনে চললে চোখ জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

চোখে জল বা পিচুটি পড়ার সবথেকে বড়ো কারণ 'চোখ ওঠা বা চোখের বাইরের স্বচ্ছ ঝিল্লির প্রদাহ বা কনজাংকটিভাইটিস। এছাড়া অশ্রুনালির রোগে চোখের জলের স্বাভাবিক নির্গমন নাকের মাধ্যমে হয় না বলে, জল চোখের কোণ দিয়ে উপচে পড়ে। চোখের যে কোণটা নাকের দিকে থাকে, তার ঠিক নীচে চাপ দিলে অনেক সময় পুঁজ বেরিয়ে এলে বুঝতে হবে অশ্রুনালিতে ঘা হয়ে তা বন্ধ হয়ে গেছে এবং অশ্রুনালিতে পুঁজ জমেছে।

নবজাতকদের ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত চোখের জল তৈরি হয় না। এই সময়ের মধ্যে যদি বাচ্চার চোখে জল দেখা যায়, তবে সেটা অস্বাভাবিক। বিভিন্ন ধরনের কনজাংকটিভাইটিসের ফলে বাচ্চাদের অশ্রুনালি জন্মগতভাবে বন্ধ থাকলে বা জন্মগত গ্লুকোমাতে নব জাতকদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। □

# বাংলা সাহিত্যে গ্রীষ্মকালীন ঝড়

**শাওন ব্যানার্জী**

'তাল ঠুকে তালগাছ, ঝড় দিলে হানা
ঝোড়ো কাক সামলায় ডিম ফোটা ছানা
বটগাছে ঝড় ভাঙে ডাল গোটা দুই
গাছ বলে ঝড় বড়ো নিষ্ঠুর তুই।'

নিষ্ঠুর-নির্দয় ঝড় যেন গ্রীষ্মকালের দোসর। 'নিঝুম মধ্যাহ্নকাল অলস স্বপ্নজালের' আড়ালে কালবৈশাখী যেন একটু একটু করে নিজের জাল বিস্তার করে। মার্চ-এপ্রিল-মে, এই তিনমাস বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প-সহ বাতাস স্থলভাগে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ভূস্তরের সেই বাতাস গরম হয়ে হালকা হয়। উপরে উঠতে থাকে সেই বাতাস। প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি হয় 'কিউমুলাস' মেঘের। আবহাওয়ার স্থিতিশীলতা না থাকলে সেই মেঘ আরও উলম্ব হয়। তৈরি হয় 'কিউমুলোনিম্বাস' মেঘ। আর এই মেঘ মানেই ঝড়-বৃষ্টি- বজ্রপাত। মেঘ মানেই 'মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে! ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!' সাধারণত উত্তর পশ্চিম থেকে এই ঝড় আসে, তাই এর পোশাকি নাম Nor'wester। আর বাঙ্গালির ভালোবাসার ডাকনাম কালবৈশাখী। মনে পড়ে যায়, মোহিতলাল মজুমদারের বিখ্যাত কবিতা :

'হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা!
অথবা ও কিরে সচল অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিড়িয়া রশ্মিছটা!'

এবার আসা যাক ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের কথায়। এটা ঠিক, ঘূর্ণিঝড় বছরের যে কোনো সময়েই তৈরি হতে পারে। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক অবস্থান বছরের যে কোনো সময় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অনুকূল। তবু আমরা যদি বিগত চার বছরের ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান দেখি, তাহলে গ্রীষ্মের সঙ্গে এর যোগসূত্র সহজেই খুঁজে পাবো। 'আমফান' পশ্চিমবঙ্গের বুকে আছড়ে পড়েছিল ২০ মে, ২০২০ সালে। তার পরের বছর, অর্থাৎ ২০২১ সালের ২৬ মে এসেছিল 'ইয়াস'। ২০২২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা গিয়েছিল 'অশনি'। আর ২০২৩ সালে জুন মাসের ১৫ তারিখে গুজরাটে দেখা দিয়েছিল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'। তাই বলা যেতেই পারে, মে-জুন মাসে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৬° সেন্টিগ্রেডের উপরে হতে হয়। জল যেহেতু তাপমাত্রা ধরে রাখে, তাই সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়লে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল, যার সঙ্গে গ্রীষ্মকালের যোগসূত্র আছে। আর বিশ্বের উষ্ণায়নের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কখন যে 'আকাশতলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠলো বাজি,' তা বলা মুশকিল।

গ্রীষ্মের দুপুরে যে 'লু' বয়, তা অনেক সময় ঝড়ের আকার নেয়। লু-এর বিস্তৃতি পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত। গ্রীষ্মের শেষে বা বর্ষা শুরুর আগে উপকূলবর্তী কর্ণাটকে এবং সম্পূর্ণ কেরালাতে যে ঝড়-বৃষ্টি দেখা যায় তা আম পাকাতে সাহায্য করে। তাই এই ঝড় 'Mango Shower' নামে পরিচিত। অসমের প্রাক-বর্ষা বা গ্রীষ্মশেষের ঝড়-বৃষ্টি স্থানীয় মানুষের কাছে 'বর্দৈই-চিলা' নামে পরিচিত। এই ঝড়-বৃষ্টি অসমের চা ও পাট চাষে খুব কাজে লাগে।

তাই সবশেষে প্রশ্ন থেকে যায়, ঝড় কি শুধু ধ্বংসের বাহক? গ্রীষ্মের প্রবল তাপে, তৃষিত মাটির বুকে ঝড় কি রসসঞ্চার করে না? এর উত্তরে বলা যেতেই পারে :

'চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি টংকার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি— তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির।'

# গরমকালে নিয়ম মেনে খাদ্য গ্রহণ করলে খুব সহজেই নীরোগ থাকা যায়

**দিতি ভট্টাচার্য**

গরম মানেই হাঁসফাঁস অবস্থা। গরমে ঘামের মাধ্যমে শরীরের জল বেশি বেরিয়ে যাওয়ার কারণে ডিহাইড্রেশন-জনিত সমস্যা হয়। সেজন্য আমাদের সুস্থ থাকার, ভালো থাকার জন্য অপরিহার্য খাদ্য খেতে হবে। কিছু খাবার গরমের অনুভূতি বাড়ায়, কিছু শরীরকে শীতল রাখে। এক কথায় বলা যেতে পারে তামসিক খাবারকে বিদায় জানিয়ে যদি সাত্ত্বিক খাবারে অভ্যস্ত হওয়া যায় তবে গরমকাল নয়, সারা বছরই সুস্থতার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে।

গরমে কী খাবেন বা কী খাবেন না, সেটার মোটামুটি ধারণা অনেকের থাকলেও, প্রত্যহ মেনু তৈরি করতে হিমসিম খেতে হয় অনেককেই। এক্ষেত্রে আমি সাধারণ অবস্থায় কোনো কমিউনিকেবল্ বা নন-কমিউনিকেবল্ ডিজিজ নেই এরকম স্বল্প পরিশ্রমে অভ্যস্ত প্রাপ্তবয়স্ক একজনের হিসেবে কিছু খাবারের মেনু বলছি পরিমাণ বাদ দিয়ে। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মানুষের ওজন, বয়স, শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে ক্যালোরি ও ডায়েট চার্ট নির্ধারিত হয়। তাছাড়া বয়স, স্বাস্থ্য, পারিবারিক অবস্থা, সময়, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি অনুযায়ী খাবারের তালিকা একজনের চেয়ে অন্যজনের ভিন্ন। কিন্তু সুষম খাদ্য গ্রহণ সকলের জন্য জরুরি। বিশেষ করে গ্রীষ্মের এই দাবদাহে এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

● দিনের শুরু করতে পারেন এক গ্লাস যেকোনো ফলের রস দিয়ে। ● চালের জিনিস সহজে হজম হয়, রুটি বা অন্যান্য গমের তৈরি খাবারের তুলনায়। তাই প্রাতরাশ হিসেবে মুড়ি, চিড়ে, খই বা সাধারণ ভাবে ভাত গরমে সহজপাচ্য। ● এর সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে টক দই / দই অথবা একটি ডিম সেদ্ধ। ● ফল খাদ্য তালিকাভুক্ত করা উপকারী। ● যারা চা খেতে পছন্দ করেন তারা ঈষদুষ্ণ চা রাখতে পারেন মেনুতে। ● প্রাতরাশের পরে এবং দুপুরের খাবারের অন্তত দু'ঘণ্টা আগে খেতে পারেন গরমের যে কোনো মরশুমি ফল বা ফলের রস।

বাঙ্গালি হিসেবে দুপুরের খাবারে প্রথম পছন্দ ভাত। ভাতের সঙ্গে হালকা করে ডাল, এক্ষেত্রে টক ডাল খাওয়া যেতে পারে। এই বিশেষ মেনুটি গরমে অনেক বাড়িতে বহুল প্রচলিত। প্রোটিনের SDA ভ্যালু সব থেকে বেশি, মানে যেকোনো প্রোটিন জাতীয় খাবার শরীরে গরমের অনুভূতি বেশি দেবে অন্যান্য খাবারের তুলনায়। তাই গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা গরমের হাত থেকে বাঁচতে কম তেল, ঝাল, মশলায় রান্না ছোটো মাছ মেনুতে রাখতে পারেন। প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে অবশ্যই রাখুন কিছু মরশুমি শাক ও সবজি। দুপুরের খাবারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন স্যালাড।

বৈকালিক আহারে খেতে পারেন ফ্রুট স্যালাড বা স্যালাড। এর সঙ্গে এক কাপ গ্রিন-টি বা যে কোনো চা ও বিস্কুট।

রাতের মেনুতে রুটির বদলে সহজপাচ্য হিসেবে ভাতকেই আগে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে মেনু দুপুরের মতো হতে পারে। যারা রুটি খেতে পছন্দ করেন তারা রুটির সঙ্গে ডাল, তরকারি এবং যেকোনো প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে পারেন। অনেকে রাত্রে দুধ খেতে পছন্দ করেন, রাতে শোয়ার আগে অল্প গরম দুধ ভালো ঘুমে সাহায্য করে।

গরমকালে পানীয় হিসেবে সবার আগে আসবে একদম সাদামাটা পরিস্রুত জল। দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল অবশ্যই খাবেন।

তালিকায় পানীয় হিসেবে আনতে পারেন আখের রস, লেবুর রস, পুদিনা পাতা, ডাবের জল, ফলের রস, পোড়া আমের শরবৎ, লস্যি-সহ আরও প্রাকৃতিক উপাদান যা শরীরের জন্য উত্তম ও ক্ষতিকর নয়। ● ঠাণ্ডা পানীয় হিসেবে কোল্ড ড্রিংক এবং অন্যান্য যেকোনো ধরণের কৃত্রিম নরম পানীয় ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন। ● দিনে একবার লবণ, চিনির জল বা ORS গ্রহণ ডিহাইড্রেশনের ভয় থেকে বাঁচাতে পারে। মরশুমি ফল ও শাকসব্জি গ্রহণ করুন। তেল, ঝাল ও মশলা কম গ্রহণ করুন। ভাজাভুজি যতটা পারেন এড়িয়ে চলুন। বড়োরা নিজেদের খেয়াল রাখার পাশাপাশি আলাদা ভাবে নজর দিন বাড়ির বাচ্চা, শিশু ও বয়স্কদের দিকে। বাচ্চাকে খাওয়ান পর্যাপ্ত পরিমাণে জল। সহজপাচ্য খাবার, ফল, ফলের রস ওদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। ডিহাইড্রেশনের কোনো রকম লক্ষণ দেখলে বাড়িতেই ORS খাওয়ানো শুরু করুন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন। খাবার রান্নার প্রতিটি ধাপে যথাযথ পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। জলের ক্ষেত্রেও একই কথা। অপরিষ্কার ও দূষিত খাদ্য ও পানীয় শরীরের জন্য হানিকর। বাসি খাবার খাবেন না।

সব শেষে বলবো, অযথা চিন্তিত না হয়ে কিছু নিয়ম ও প্রকরণ মেনে চললে গরমকাল নিশ্চিন্তে হেসেখেলে নীরোগ ভাবে কাটিয়ে দিতে পারবেন।

# জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদ অনুসন্ধানেই জল সমস্যার সমাধান

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর দেশ ভারতে মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন এই ৪টি মাস গ্রীষ্মকাল রূপে পরিগণিত হয়। ভারতের নানা প্রান্তে এই সময় দিনের বেলা গড় তাপমাত্রা পৌঁছে যায় ৪১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। রাতের তাপমাত্রা থাকে ২৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো তীব্র তাপপ্রবাহ। যার প্রভাবে জলাভূমি, পুকুর, দীঘি, নদীনালা, খাল-বিল যায় শুকিয়ে। কৃষিকাজে সেচের জল হয় অপ্রতুল। প্রতিটি অঞ্চল থেকে উঠে আসে চাষের জমির ফুটিফাটা চিত্র। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাজে জল সংগ্রহে ঘরের মেয়েদের প্রত্যহ যেতে হয় অনেকটা দূরে। ভূগর্ভস্থ জলের সরবরাহ ছাড়া জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জল ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব সত্যিই বিপন্ন। ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এই জলভাণ্ডারকেও শেষ করে ফেলছে প্রতিদিন। এর পরিণামে ভৌমজলের স্তর বা ওয়াটার টেবিল প্রতিনিয়ত নেমে যাচ্ছে, পরিবর্তে উঠে আসছে আর্সেনিকের স্তর। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ, ফ্লোরাইড সংক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের বহু ব্লকে গ্রীষ্মকালীন যন্ত্রণা। পশ্চিমবঙ্গের তাপপ্রবাহ ও পানীয় জলের হাহাকার-পীড়িত জেলাগুলি হলো— বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, আসানসোল। বঙ্গোপসাগর সমীপে অবস্থিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মাটির নীচে লবণাক্ত জলের সমস্যা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত হুগলী-মাতলা নদীর মোহনায় অবস্থিত অগণিত ব-দ্বীপগুলিতে পানীয় জল ও কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মিঠে জলের সংকট গ্রীষ্মকালে তীব্র আকার ধারণ করে।

সারফেস ওয়াটার বা নদীনালা, পুকুর, খালবিলের জল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে যে সব এলাকায় পাইপ লাইনের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় না, বা যেখানে নলবাহিত, পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা গড়ে ওঠেনি, সেই এলাকাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলই পানীয় জল হিসেবে এবং ব্যাপক ভাবে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই এলাকাগুলিতেই আজ ভূগর্ভস্থ জলস্তর প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে। সেই সব গ্রামীণ এলাকাতেই আর্সেনিক দূষণের পরিমাণও বেশি। কিছু শিল্পাঞ্চলে জলের সরবরাহ জলসংকটে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এবং অপুষ্টিজনিত মানুষরাই আর্সেনিক দূষণজনিত ব্যাধি আর্সেনিকোসিসের প্রধান শিকার। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, সচেতনতার অভাব এবং বিকল্প পানীয় জলের উৎসের অভাবে আর্সেনিক দূষণ এক মহামারীতে পরিণত হতে চলেছে। অধিশোষণ, অধঃক্ষেপণ, সহ-অধঃক্ষেপণ, আয়ন-এক্সচেঞ্জ প্রসেস, মেমব্রেন ফিলট্রেশনের মতো রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির সাহায্যে দূষিত জলকে আর্সেনিক মুক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিগুলি ছাড়াও ফাইটো রেমেডিয়েশন পদ্ধতিটিও আর্সেনিক দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি অন্যতম গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। গবেষকদের মতে Ludwigia parviflora, Ageratum conyzoides প্রভৃতি উদ্ভিদ মাটি ও জল থেকে আর্সেনিক শোষণ করে। তাই এই জাতীয় উদ্ভিদের বীজ আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় ছড়ালে আর্সেনিক দূষণের সঙ্গে সঙ্গে সবুজায়নেরও সহায়ক হবে। ফলে বায়ুদূষণও কমবে। অধিশোষণ ও সহ-অধঃক্ষেপণ— এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়েই সম্পূর্ণ নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া সম্ভব। দূষিত জলে Activated Alumina, ফেরিক হাইড্রক্সাইড ও ব্লিচিং পাইডার বা ক্লোরিন যোগ করার পর জল ফিল্টার করলে নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে জল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুত পরিস্রুত পানীয় জল অতি সত্বর তাপপ্রবাহ আক্রান্ত, আর্সেনিক প্রবণ এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। কারণ মানুষের যত রকম চাহিদা ও দাবিদাওয়া আছে— পানীয় জলের দাবির চাইতে অগ্রগণ্য আর কিছুই হতে পারে না। বিকল্প হিসেবে গভীর নলকূপের জল ব্যবহার করা যেতে পারে। নলকূপের গভীরতা সর্বনিম্ন ১০০ মিটার হওয়া উচিত। অধিক জলোত্তোলনের ফলে সেই ক্ষেত্রেও জলস্তর নেমে গিয়ে আর্সেনিকের উঠে আসার দরুন এই ধরনের আর্সেনিক মুক্ত নলকূপের জলেও আর্সেনিক পাওয়া যেতে পারে। নলকূপ খননের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন যাতে কোনোভাবে জল চুঁইয়ে আর্সেনিক দূষিত স্তরের ভেতর দিয়ে উৎস মুখে না মেশে। গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে পুকুর খনন করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ছাড়াও খরা প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে নদীগুলিতে চেকড্যাম ও জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার বিকাশ বিশেষ প্রয়োজন। অপরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে জলাভূমি বুজিয়ে ফেলার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। পুকুর, বিল,বাঁওড় ইত্যাদি জলাভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইনের কঠিন প্রয়োগ প্রয়োজন।

নদীর জমি দখল করে বেআইনি বালিখাদান, ইটভাটা বন্ধ করতে হবে। জোর দিতে হবে নদী সংযুক্তিকরণ ও বনসৃজনে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর কথা ভেবে, সামগ্রিক জলদূষণ প্রতিরোধে প্রতিটি এলাকায় সংরক্ষিত জলাশয়ের মাধ্যমে, শহরগুলিতে বাড়ির ছাদের ওপরে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ওই জলাধারগুলি যেন ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার সূতিকাগারে পরিণত না হয়। ■

# গরমে সুস্থ থাকতে প্রচুর জল আর মরশুমি ফল খান

**ডাঃ দেবাশিস পাহাড়ি**

অন্য সমস্ত ঋতুর থেকে একটু হলেও আলাদা গরমকাল। আর যখন থেকে এই গরমকালের সূচনা হয়, সেই সন্ধিক্ষণ থেকেই নানা কারণ আমাদের শরীরকে বিব্রত করতে থাকে। আমাদের শরীরকে রক্ষা করার দায়িত্ব অনেকটাই নিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। আমরা যদি তাঁর দেওয়া দানকে গ্রহণ করি, তাহলে দেখব আমাদের শরীরে সেই অর্থে কোনো রোগ বাসা বাঁধতে পারবে না। তাই আমরা যারা আয়ুর্বেদ নিয়ে একটু চর্চা করি, তাঁরা প্রথমেই বলি, প্রকৃতি যে দান আমাদের প্রতি মরশুমে দেয়, সেই দান কিন্তু আমরা কোনো মতেই অবহেলা করব না। সে সবজি হোক বা ফল। এসব গুলিই আমাদের শরীরকে রোগ থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে থাকে। আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করা। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এই প্রকৃতির

দান আমরা। এই প্রকৃতিই আমাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর সব দিক দিয়েই আমাদের রক্ষাকবচ হয়ে রক্ষাও করে চলেছে।

গরমকালে আমাদের বায়ু ও পিত্ত সংক্রান্ত নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এই দুটির কারণে শরীরে দেখা দেয় নানা উপসর্গ। গরমকালে এই দুটিকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই সময়ে আমাদের প্রকৃতি আমাদের নানা জিনিস দিয়েছে। যেমন, শশা, তরমুজের মতো ফল দিয়েছে, তেমনি সবজি হিসেবে দিয়েছে ঢ্যাঁড়স, পটোল, ঝিঙা। এগুলির হালকা ঝোল বা তরকারি খেলে আমাদের বায়ু ও পিত্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য।

বর্তমানে আমরা পুরোপুরি নির্ভর করে আছি প্রসেসড্ ফুডের ওপর। এই নির্ভরতাই আমাদের রোগী বানিয়ে ছেড়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের দিকে নজর টানতে চাই। আমরা এখন সময় বাঁচাবার জন্য একদিন রান্না করে চারদিন ধরে ফ্রিজে রেখে খাই, সেটা কিন্তু কোনোভাবে আমাদের শরীরের কোনো উপকারে আসছে না, উলটে ক্ষতি করছে। আরেকটি বিষয়ের দিকেও নজর আনতে চাই, সেটা হলো জাংক ফুড বা পিৎজা জাতীয় খাবার খেয়ে সেই ছোটোবেলা থেকেই আমরা আমাদের শরীরকে একটু হলেও স্থূলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এই অবস্থা থেকেও নানা রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাঁধতে ছুটে আসছে।

গরমের সময় আমাদের আমাদের শরীরের গোপন জায়গায় ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখা দেয়। সঙ্গে চুলকানির প্রকোপ। এর থেকে বাঁচার খুব সহজ উপায় হলো সারা গায়ে সর্ষের তেল অথবা নারকেল তেল মেখে তারপর স্নান করা। এতে সারা শরীরের লোমকূপগুলির মুখ যেমন পরিষ্কার হবে, তেমনি একটা ময়শ্চারাইজারের প্রলেপ পড়বে। আর এই প্রলেপের কারণে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে না।

অনেকে বলেন এই এই সময়ে স্নান করব কতবার? আমরা বলে থাকি দুই থেকে সর্বাধিক তিনবার পর্যন্ত করা যেতে পারে।

অনেকে এই সময়ে নানা ক্রিম বা হারবাল জেল লাগান। তাদের উদ্দেশে বলা যায় যে আপনারা ওই সব হার্বাল বা প্রকৃতিজাত ক্রিমে কতটা রাসায়নিক উপাদান আছে সেটা দেখে ব্যবহার করবেন। কেননা আপনি যেটাকে প্রকৃতিজাত বলে ভেবে নিয়ে ব্যবহার করছেন, সেটা ওইসব রাসায়নিক উপাদান বেশি থাকার কারণে উপকার না করে ক্ষতি করতে পারে। একেবারে প্রকৃতিজাত জেল বা ক্রিম চেনার উপায় হলো, ওই জেল বা ক্রিমে হার্বাল বিষয়টি সিংহ ভাগ উপাদান হিসাবে আছে কিনা সেটা দেখে তবেই কিনবেন। সামান্য মাত্রায় থাকলে কিনবেন না। এই বিষয়ে সচেতনতা থাকাটা সবার ক্ষেত্রেই জরুরি।

এই সময়ে বায়ু ও পিত্তের অস্বাভাবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই, আপনি সুস্থ থাকবেন। আর বেশি করে জল খাবেন। বাইরে বেরোলে সঙ্গে খাবার জল অবশ্যই নিয়ে বেরোবেন। পারলে একটা করে ডাবের জল নিজে যেমন খাবেন, তেমনি আপনার বাচ্চাকেও খাওয়াতে চেষ্টা করবেন।

আবারও বলি, বেশি মশলা যুক্ত খাবার, তেলে ভাজা, জাংক ফুড এই সময়ে একটু এড়িয়ে চলুন। সহজ পাচ্য খাবার একটু বেশি খান। আর শরীরকে ঢাকুন হালকা পোশাকে। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

# পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ বর্তমান পরিস্থিতি

**অনিকেত বৈশ্য**

পশ্চিমবঙ্গ ভারত ভূখণ্ডের একমাত্র রাজ্য যার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মোট ভৌগোলিক এলাকা ৮৭, ৮৫৩ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক অনন্য উদাহরণ হলো পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা নিয়ে গঠিত হিমালয় অঞ্চল। পূর্ব ছোটোনাগপুর মালভূমির সীমানা পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশ, মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়ার উত্তর ও পশ্চিম অংশ, সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অনেকটা অংশ নিয়ে গঠিত। বাকি জেলাগুলি নতুন ও পুরোনো গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গকে বলা যেতে পারে এক নদীমাতৃক কৃষিভিত্তিক রাজ্য, যার প্রধান নদী দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গা এবং এর অসংখ্য শাখা নদী। গঙ্গানদীর অববাহিকার পূর্ব অংশে মহানন্দা, জলঙ্গী, ভৈরবী প্রভৃতি নদী রয়েছে এবং পশ্চিম অংশে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতী। উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা। এগুলো ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোটো স্বাধীন নদী অববাহিকা রয়েছে। যেমন সুবর্ণরেখা অববাহিকা মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ জুড়ে। এই নদীগুলি হলো রাজ্যের জীবন জীবিকার অন্যতম ভিত্তি। পশ্চিমবঙ্গের ভূপৃষ্ঠের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের এক বিপুল সম্ভার রয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য গবেষকদের তরফে ২০১৪ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বার্ষিক ভূপৃষ্ঠের জলের পরিমাণ ১৩২.৭৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। আবার সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের (২০২২) রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জলের রিচার্জ হলো ২৩.৬১ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং বার্ষিক নিষ্কাশনযোগ্য ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের পরিমাণ ২১.৪২ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। যার ৮০ শতাংশ জল শুধুমাত্র কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হলো ১৭৫ সেন্টিমিটার (সেমি)। প্রায় ১২৫ সেমি বৃষ্টিপাত হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। এই বৃষ্টিপাতের ফলে ৭৮.৩৬ শতাংশ গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হয় (সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড, ২০২২)। ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জলের সঠিক বৈজ্ঞানিক ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার এক বড়ো চিন্তার কারণ। অত্যধিক পরিমাণ নলকূপের ব্যবহার শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারকেই নষ্ট করছে না, তার সঙ্গে জলের গুণগতমানকেও নষ্ট করছে। রায় ও অন্যান্য গবেষকদের তরফে ২০২৩-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ৩৩.৯৩ শতাংশ বাড়িতে নিজস্ব শুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ আছে। প্রথম জাতীয় জলাশয়ের গণনা অনুসারে, ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি জলাশয় আছে এবং তাদের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের ৫৫.২ শতাংশ (১৩,৩৮,৭৩৫) জলাশয়ের মালিকানা বেসরকারি সংস্থার এবং ৪৪.৮ শতাংশ (১০,৮৫,৮০৫) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ শুমারির তথ্য অনুসারে গভীর নলকূপের সংখ্যা ১১০৬৩, পাতকুয়া ৫৭৫৪, অগভীর নলকূপ ৩৮৭৪৯৪ এবং মিডিয়াম নলকূপ ২২৪৩৩। বর্তমানে ষষ্ঠ ক্ষুদ্র সেচ শুমারির তথ্যে জানা যায় কোনো জায়গার নলকূপের সংখ্যা। নতুন নলকূপ খননের জন্য 'স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেট'-এর টিউবওয়েল রেজিস্ট্রেশন ডেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অবৈজ্ঞানিক ভাবে আরও কত নলকূপ আছে তার কোনো সঠিক তথ্য নেই। অগাধ জলসম্পদ থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধ পানীয় জল সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। অত্যধিক ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনের জন্য জলভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া গঙ্গা অববাহিকা বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা ইত্যাদি জেলাগুলিতে আর্সেনিক প্রদূষণ অনেকাংশে বেড়েছে। বেশ কিছু জায়গায় নলকূপের খনন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বা নতুন করে খননের কোনো অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে দেখা যাচ্ছে যে আর্সেনিক ধানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এছাড়া এই সব জায়গায় জলের মধ্যে আয়রনের পরিমাণও বেশ অনেকটা বেড়ে গেছে। ছোটোনাগপুর মালভূমির বেশ কিছু জায়গায় জলের মধ্যে ফ্লোরিনের মাত্রা অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করছে। জলের এই গুণগত মান যাতে অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকে তার জন্য সরকার এবং জনগণকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। ■

ফ ঃ ৪

# গরমে ত্বককে রক্ষার উপায়

**ডাঃ ইমরান ওয়ালি**

এই গরমকালটা আমাদের কাছে খুবই অস্বস্তির। ঘাম আর ফাঙ্গাল সংক্রমণ, আর তা থেকে সারা শরীরে চুলকানি নিয়ে জেরবার আমরা সবাই। অথচ সারাক্ষণ একটা কোনো না কোনো অস্বস্তি আমাদের তাড়া করছে। প্রত্যেককে বলব, প্রতিদিন একটু হলেও ব্যায়াম বা এই ধরনের কিছু করুন। কারণ আমাদের শরীরে ঘাম না এলে আমাদের ত্বক তার আপন ছন্দ হারিয়ে ফেলে। সে নিজে থেকেই নিজেকে ক্ষতি করতে শুরু করে। ভাজাভুজি খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন, আর প্রতিদিন একটা করে মরশুমি ফল খান। শরীরকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। পারলে দুই থেকে তিনবার স্নান করুন।

প্রতিদিন খাবারের মেনুতে শুক্তো রাখুন। এই শুক্তোই আপনার ত্বককে তরতাজা ও ভালো রাখতে সাহায্য করবে। বাইরে বেরোবার সময় শরীরের খোলা জায়গায়, যেখানে সূর্যের তাপ লাগতে পারে, সেই জায়গায় সানস্ক্রিন লোশন লাগিয়ে বেরবেন, আর ফিরে এসে দিনের শেষে মুখটাকে ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। যদি মনে করেন ভালো ফেসওয়াস ব্যবহার করতে পারেন। বাইরে বেরলে অবশ্যই ছাতা নিন।

নানা কারণে আমাদের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটা দূষণ থেকে হতে পারে, খাবার থেকেও হতে পারে। মনে রাখবেন, ত্বকের অকাল বার্ধক্য আসে কিন্তু খাবার থেকেই। আমাদের খাবারের অভ্যাস, জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা অনেকেই জাংক ফুডের ওপর বেশি করে নির্ভর হয়ে পড়েছি। এই জাংক ফুড কিন্তু আমাদের শরীরের নানা ক্ষতি করছে। তাঁর প্রভাব পড়ছে ত্বকের ওপর। লিভার, কিডনি বা হজম সংক্রান্ত নানা কারণে সবচেয়ে আগে ক্ষতি করতে শুরু করছে আমাদের ত্বককে। এই সময় সবাই তাদের রোজের মেনুতে শুক্তো রাখুন। একদিকে করলা, অন্যদিকে নানারকম সবজি। এই শুক্তো আপনার শরীরকে নানা দিক দিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তেমনি রক্ষা করবে আপনার ত্বককে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবার অভ্যাস পরিবর্তন করতেই হবে। তবেই দেখবেন আপনার ত্বকের অকাল বার্ধক্য

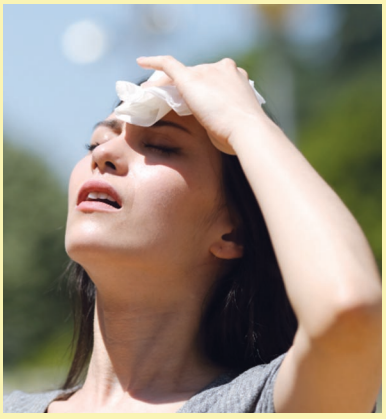

আসবে না। কম বয়েসে আপনার শরীর অনেক অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু একটু বেশি বয়েস হলে সেই ক্ষমতা অনেকটাই চলে যায়।

আমাদের একটা প্রবণতা হলো নিজের মতো করে অনেক কিছু ঠিক করে নেওয়ার। যেমন, মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু জেনে ত্বককে ভালো করার জন্য ব্যবহার করে ফেলি। কিন্তু ভালোভাবে না জেনে, একেবারে অজানা কিছু ব্যবহার আমাদের উপকারতো করেই না, উলটে নানা বিপদ ডেকে আনে। আমাদের ত্বকে দাদ বা চুলকানি হলে বাজার থেকে যে কোনো একটা ক্রিম কারোর পরামর্শ (চিকিৎসক নন এমন ব্যক্তি) মতো এনে ব্যবহার করতে শুরু করলাম। প্রকারান্তরে আমাদের ত্বকের বিপদ কিন্তু আমরাই আবার ডেকে আনলাম। কেননা অধিকাংশ ক্রিম স্টেরয়েড নির্ভর। সাময়িক স্বস্তি দিলেও, স্থায়ী লাভ হয় না। ফলে ত্বকের কোনো রকম অস্বাভাবিকতাকে নির্মূল করতে পারা যায় না। ত্বক আমাদের দর্শনধারীর কাজ করে। তাকে ঠিক রাখতে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখলেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অবহেলা একেবারেই করবেন না।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, গরমকালে বার বার স্নান করলে কি ত্বক ভালো থাকে? আমি বলি, যাই করুন না কেন, ত্বককে ঠিক রাখার জন্য হাইজিনের দিকটায় বেশি নজর দিতেই হবে। এই গরমে আপনি তিনবার স্নান করতেই পারেন। কিন্তু আমাদের সারাদিনের ব্যস্ততায় সেটা সম্ভব হয় না। তাই হাইজিনের দিকে লক্ষ্য রেখে দু'বার স্নান করা যেতেই পারে। অনেকে প্রশ্ন করেন, যে তাঁরা অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করছেন। বিষয়টা ঠিক করছেন না বেঠিক করছেন? ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ওই বস্তুটিতে কতটা অ্যালোভেরা কন্টেন্ট আছে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে খুব সামান্য পারসেন্টেজে আছে। এই ধরনের জেল উপকারের জায়গায় ক্ষতি করে বেশি। ত্বক ঠিক রাখতে এই ১২টি বিষয় মেনে চলার চেষ্টা করুন।

১. সহজ পাচ্য খাবার খান। ২. জল একটু বেশি খান। ৩. প্রতিদিনের মেনুতে শুক্তো রাখুন অথবা সামান্য হলেও সবজি সহযোগে তেতো খান। ৪. বাইরে বেরলে সঙ্গে ছাতা আর জলের বোতল নিন। রৌদ্রে অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করুন। ৫. শরীরের যে অংশ বাইরে থাকে সানস্ক্রিন লোশন লাগান। সারাদিন পর ফিরে এসে একটু ভালো ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। ৬. শরীরের হাইজিনের বিষয়টা লক্ষ্য রাখুন। ৭. টাওয়েল বা গামছা আলাদা ব্যবহার করুন, আর যেন এই গামছা শুকনো থাকে সব সময়। ৮. ঢিলেঢালা হালকা রঙের জামা কাপড় পরুন। ৯. যে কোনো মরশুমি ফল রোজ একটা করে খান। ১০. এই গরমে তেল একটু কম খাবার চেষ্টা যেমন করবেন, তেমনি তেলে ভাজা যে কোনো খাবারকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। ১১. বাইরের খাবার আর বাইরের কাটা ফল একেবারেই নয়। ১২. ত্বকের যে কোনো অস্বাভাবিকতায় উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ সবার আগে নিন। ■

# সহকার ভারতীর উদ্যোগে রপ্তানি সচেতনতা কর্মসূচি

গত ২৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সহকার ভারতীর উদ্যোগে এবং স্টেট এক্সপোর্ট ফেসিলিটিশন সেন্টারের সহযোগিতায় কলকাতা আইআইএফটি ক্যাম্পাসে রপ্তানি যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের একদিবসীয় রপ্তানি সচেতনতা কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সেলফ হেল্ফ গ্রুপ, প্রাইভেট প্রোপাইটার, কো-অপারেটিভ এবং এফপিও-র প্রতিনিধিরা। কর্মশালায় রপ্তানির নানা বিষয়ে যেমন, বিভিন্ন দেশের ক্রেতা মনোভাব, দেশ অনুযায়ী পণ্য চাহিদা, জিআই এবং নন জিআই পণ্যের তফাত, পণ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। আইআইএফটি সেন্টারের হেড প্রফেসর ড. কে রঙ্গরাজন বলেন, বারবার সচেতনতার মাধ্যমে প্রথমেই আমাদের মন থেকে এক্সপোর্ট ভীতি দূর করতে হবে। স্টেট এক্সপোর্ট ফেসিলিটেশন সেন্টারের রক্তিমবাবু বলেন, আমরা সবসময় উদ্যোক্তাদের পাশে আছি এবং থাকবো।

সব ধরনের সরকারি সাহায্য যাতে আমাদের উদ্যোক্তারা পান তার ব্যবস্থা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা আগামী জুলাই/ আগস্ট মাসে একটি অনলাইন বৈঠক এবং নভেম্বর/ ডিসেম্বর মাসে একটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রেতা-বিক্রেতা মিট কনক্লেভের আয়োজন করব যাতে আমাদের উদ্যোক্তারা লাভবান হন। সহকার ভারতীর রাজ্য সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক বলেন, ১৯৮৯ সাল থেকে সহকার ভারতী ভারতবর্ষের আর্থিক বিকাশের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সমবায় আন্দোলন, সমবায় বৃদ্ধি, সমবায় বিকাশ, সেলফ হেল্ফ গ্রুপের বিকাশ এবং এফপিও-র বিকাশের মাধ্যমে সমাজের আর্থিক উন্নতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সহকার ভারতী। এই ধরনের কর্মসূচি আগামীদিনে অনেক উদ্যোক্তা তৈরি করবে– এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সহকার ভারতী কলকাতা জেলার সম্পাদক অশোক কুমার কয়াল বলেন, ভারতের আর্থিক উন্নয়নে সহকার ভারতীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

## সেবা ভারতীর রক্তদান শিবির

গত ২৪ মার্চ সেবা ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার উদ্যোগে বোড়াল সূর্য সেন কলোনির বিপ্লবী একতা সংঘ ক্লাবে এক স্বেচ্ছায় রক্তাদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৪ জন মহিলা ও ২৫ জন পুরুষ-সহ মোট ২৯ জন রক্ত দান করেন। শিবিরের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্লাবের সদস্যরা এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা।

উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক শিবদাস বিশ্বাস, বিভাগ প্রচারক পরিতোষ সাহা, বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ অজয় কুমার সাহু, সেবা ভারতীর সভাপতি অজিত বসু, সহ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ দাশ।

## গাজোল সংস্কার ভারতী ও সৃষ্টি-র যৌথ উদ্যোগে দোল উৎসব উদ্‌যাপন

মালদহ জেলার গাজোল সংস্কার ভারতী এবং আবৃত্তিচর্চা ও অঙ্কন প্রশিক্ষণের আদর্শ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি-র যৌথ উদ্যোগে গাজোল শান্তি লজে পালিত হলো দোল উৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী, মালদহ জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার, জেলা সদস্য নভেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিধান রায়, গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক কে ডি ভট্টাচার্য। সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীত পরিবেশন করেন পরেশচন্দ্র সরকার সঞ্জয় কুমার নন্দী। অতিথিগণের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

# দুর্গাপুরে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন ও আলোচনা সভা

অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞা প্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞা এবং দুর্গাপুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ মার্চ দুর্গাপুর এনআইটি-র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হলো লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন-১৭ এবং

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত ও বর্তমান স্থিতির ওপর এক আলোচনা সভা। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব'। উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞা প্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ।

প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন দুর্গাপুর এনআইটি-র নির্দেশক ড. অরবিন্দ চৌবে। অনুষ্ঠানের সংযোজক অধ্যাপক পরিমল আচার্য ড. চৌবের শৈক্ষণিক ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রীচৌবে তাঁর ভাষণে বলেন, হাজার হাজার বছর আগে ভারতের মুনি-ঋষিরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা করেছিলেন। বর্তমানে যা কিছু গবেষণা হচ্ছে তা চিকিৎসাক্ষেত্র হোক বা পারমাণবিক ক্ষেত্র, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই দেশ-বিদেশে সেই গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রজ্ঞা প্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে বলেন, জ্ঞানীলোকেরা এক হাতে শাস্ত্র আর অন্য হাতে শস্ত্র ধারণ করে রাষ্ট্রের বিকাশে আত্মনিবেদন করে থাকেন। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতাই দেশকে উন্নত করে।

আলোচনা সভায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক, অভিভাবক মিলিয়ে ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার হিমাংশু মাইতির উপস্থিতিতে কয়েকটি পুস্তকের লোকার্পণ করে ভাষণ রাখেন বিশ্বভারতীর অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য লোকপ্রজ্ঞা বিজ্ঞান প্রমুখ ড. রাসবিহারী ভড়, লোকপ্রজ্ঞার শৈক্ষণিক প্রমুখ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, মাতৃশক্তি প্রমুখ সুতপা ভড়, ছাত্রশক্তি প্রমুখ শশাঙ্ক নায়েক এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক মনোরঞ্জন হাজরা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লোকপ্রজ্ঞা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক গোপাল বিশ্বাস এবং অধ্যাপক অভিষেক সাহা।

## সিউড়ীতে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার সামাজিক সংগঠন 'শ্রদ্ধা' গত ২৪ মার্চ সিউড়ী সেহড়াপাড়া নিবাসী এবং বীরভূম জেলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অনন্ত মালাকারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন আগমানন্দ ঘোষাল। শ্রীমালাকারকে পূজা করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। মাল্যভূষিত করেন সংগঠনের সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন জগবন্ধু ব্যানার্জী। প্রাস্তাবিক ভাষণ দান করেন বিশ্বনাথ দে। শ্রীমালাকারকে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা, শুভ্রা ব্যানার্জী, মানব রায়, অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মহাদেব চন্দ্র। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সহযোগিতা করেন সুজাতা বিষ্ণু। শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। সংগীত পরিবেশন করেন অলোকা গাঙ্গুলি, অসীমা মুপখোপাধ্যায় ও সৈকত সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চৈতালী মিশ্র।

# ওঁ বা ওঙ্কার ঈশ্বরের সমস্ত নামের প্রতিনিধিস্বরূপ

**কানু রঞ্জন দেবনাথ**

ওঁ বা ওঙ্কার বা প্রণব হিন্দু দর্শনের সর্বোচ্চ ব্রহ্মবাচক শব্দ। শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন— ওঁ, ওম, ঔং, অউম, ওঁ--এই পাঁচ প্রকার উচ্চারণের মধ্যে বস্তুগত বা অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ওঙ্কার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ঈশ্বরেরও প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, ওঁ হতে ওঁ শিব, ওঁ কালী, ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন। ওঙ্কার বৌদ্ধ ও জৈনদেরও একটি পবিত্র প্রতীক। শিখ সম্প্রদায়ও এটিকে শ্রদ্ধা করে।

ওম্ শব্দটি সংস্কৃত আব ধাতু থেকে উৎপন্ন, যা একাধারে ১৯টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী ওঙ্কার এমন এক শক্তি যা সর্বজ্ঞ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, অজ্ঞাননাশক ও জ্ঞানপ্রদাতা। ওঙ্কারকে ত্র্যক্ষরও বলা হয়। কারণ ওঁ তিনটি মাত্রাযুক্ত -- অ-কার, উ-কার ও ম-কার। অ-কার আপ্তি বা আদিত্ব অর্থাৎ প্রারম্ভের প্রতীক। উ-কার উৎকর্ষ বা অভেদত্ব অর্থাৎ স্থিতির প্রতীক। ম-কার মিতি বা অপীতি অর্থাৎ লয়ের প্রতীক। অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটনকারী ঈশ্বরের প্রতীক। এক কথায় ওম্ শব্দ দিয়ে ভগবানের তিনটি প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নির্দেশ করে থাকে। প্রণব শব্দের আক্ষরিক অর্থ যা উচ্চারণ করে স্তব করা হয়। এর অপর অর্থ যা চিরনতুন । মৃত্যুকালে ওঙ্কারের উচ্চারণে স্বর্গলাভ হয় বা পরম সত্য লাভ হয়। পতঞ্জলির যোগসূত্রে ওঙ্কারকে ঈশ্বরের প্রতীক বলে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ওঙ্কারের স্মরণে ও উচ্চারণে সমাধি লাভ করা যায়।

**গুরুত্ব ও ব্যাখ্যা :** ওম্ বা ওঙ্কার ঈশ্বরের সকল নামের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ নাম। বেদ-উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রে সর্বত্রই ওঙ্কারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণের একটি কাহিনি অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র ওঙ্কারের সহায়তায় দৈত্যদের পরাজিত করেন। কঠোপনিষদ মতে, ওঙ্কার পরব্রহ্ম। মুণ্ডক উপনিষদে ওঙ্কার অবলম্বনে ঈশ্বর উপাসনার কথা বলা হয়েছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি সকল অক্ষরের মধ্যে ওঙ্কার (গীতা ৭/৮)।

ওঁ একটি ছোট্ট শব্দ বলে মনে হতে পারে, তবে এই কথাটি সবার মনে রাখা উচিত যে হিন্দু সংস্কৃতি অনুসারে মহাবিশ্বের প্রথম ধ্বনি ওঁ-কেই বলা হয় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি হিসেবে বিবেচিত হয়। ওঁ-ই সৃষ্টির আদি ধ্বনি। মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট ওঁ। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ওঁ হচ্ছে সক্রিয় ভাব। (এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা এক নয়। ব্রহ্ম হলেন পরমেশ্বর আর ব্রহ্মা একজন দেবতা)। এই সক্রিয় ভাব হতেই সৃষ্টির বিকাশ।

ওঁ হলো প্রণব। সকল মন্ত্রের আদিবীজ। অব্যয় মানে যার কোনো ব্যয় বা ক্ষয় নাই। অক্ষয়, অবিনাশী বা অপরিবর্তনীয়। কোথাও-বা ব্রহ্ম। মন্ত্রের আদিতে বা আগে ওঁ বলতে হয়। সংস্কৃত মন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো— মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ। অর্থাৎ মন্ত্র মানে যা মনন করে মানুষ জন্ম-মৃত্যু, সংসার-সমুদ্র, মায়া বা অবিদ্যা থেকে মুক্তি পায়। সহজ কথায় মন্ত্র হলো আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক সংকেতসূত্র, যা বারবার আবৃত্তির দ্বারা অজ্ঞানের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। মন্ত্রের আগে ওঁ উচ্চারণ করলে মন্ত্রের উচ্চারণকালে কোনো ভুল হলে সেই ভুলের দোষ নষ্ট হয়ে যায়।

ওঁ উচ্চারণে 'অ' অক্ষরে হ্রস্বস্বর, 'উ' অক্ষরে প্লুতস্বর এবং 'ম' অক্ষরে আবার হ্রস্বস্বর। হ্রস্বস্বর উচ্চারণের সময় একমাত্রা, দীর্ঘস্বর উচ্চারণের সময় দ্বিমাত্রা এবং প্লুতস্বর উচ্চারণের সময় ত্রিমাত্রা সময় লাগে। সচ্চিদানন্দ শব্দটিকে ভাঙলে বা সন্ধি বিচ্ছেদ করলে

দাঁড়ায় সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ। সৎ শব্দের অর্থ হলো অস্তিত্ব অর্থাৎ যা তিনকালেই আছে। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এককথায় সৎ মানে অনাদি অনন্ত। একমাত্র ব্রহ্মই অনাদি, অনন্ত, নিত্য। চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য, যা উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে প্রাণস্বরূপ প্রকাশিত। এই বিশ্বচরাচরের বা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বপ্রাণীতে, সর্ববস্তুতে তিনিই বিভু, চৈতন্যরূপে অনুসৃত হয়ে আছেন। আনন্দ একটি বিশিষ্ট স্পন্দন বা অনুভূতি, যা সমস্ত সৃষ্টির মূল। তিনি রসরূপ, আনন্দস্বরূপ। বেদ বলেছেন তিনি নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ইচ্ছাই প্রথম স্পন্দন। এই স্পন্দনই ওঁ বা ওঙ্কার। এই জগৎ সৃষ্টির মূলেও এই ওঙ্কার বা অনাহত নাদ। নাদ কথাটির অর্থ শব্দ। বস্তুজগতে শব্দের সৃষ্টি হয় বাতাসের সঙ্গে কোনো বস্তুর সংঘাতের ফলে। ওঙ্কার সেরকম কোনো শব্দ নয়। কারণ ওঙ্কার সৃষ্টির আগে তো বায়ুর অস্তিত্বই ছিল না। মূল স্পন্দন ওঙ্কারই বিকার প্রাপ্ত হতে হতে দৃশ্যমান বিশ্ব চরাচরের সমস্ত কিছুর মূল উপাদান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে (ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি) সূক্ষ্মরূপে পরিণত হলো। তারপর এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের বিশেষ সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া,— যাকে বলে পঞ্চীকরণ,— তার দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের (ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি) (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি) সৃষ্টি হলো। একেই আমরা বলি জগৎ।

ওঁ-কে কেন সকল শব্দের জননী বলা হয়। একজন সন্ন্যাসী একসময় একটি পাথর বিক্রি করার জন্য একজন জহুরির কাছে গেলেন। জহুরি পাথরটি দেখে নাড়াচাড়া করে দেখে অবাক হয়ে যান এবং সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন যে পাথরটি তিনি কোথা থেকে এনেছেন বা কোথায় পেয়েছেন? উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন যে, এই পাথরটি তাঁর গুরু তাকে দিয়েছেন। জহুরি বললেন যে এই পাথরটি খুবই মূল্যবান। কাজেই এই পাথর কেনার সামর্থ্য বা এর মূল্য দেবার সামর্থ্য তার নেই। সন্ন্যাসী পাথরটি নিয়ে অন্য এক জহুরির কাছে গেলেন। কিন্তু কেউই এর মূল্য দিতে পারলেন না বা কেউই এই পাথরটিকে কিনতে পারলেন না আর সন্ন্যাসীও এটিকে বিক্রি করতে পারলেন না। ক্ষোভে, দুঃখে ও ব্যথিত মনে সন্ন্যাসী তার গুরুর কাছে গিয়ে বললেন, 'গুরুদেব, আপনি জানেন যে এই পাথরটি মহামূল্যবান, তা সত্ত্বেও কেন এই পাথরটি আপনি আমায় দিলেন? গুরুদেব মুচকি হেসে বললেন এই পাথরের মতো আমাদের চারিপাশে এমন অনেক মহামূল্যবান জিনিস আছে, যা আমরা চিনি না বা জানি না। এইরকম একটি মহামূল্যবান জিনিস হলো ওঁ বা ওম্। এই ওমের অর্থ বা মাহাত্ম্য আমরা ক'জনেই বা জানি? কথিত, কার্তিকেয় একদিন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে যান এবং ওম্ শব্দের অর্থ জানতে চান। প্রজাপতি এই প্রশ্ন শুনে হতচকিত হয়ে গেলেন। কারণ তাঁর কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। দেব সেনাপতি কার্তিকেয় এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রজাপতিকে বন্দি করেন। প্রজাপতিকে বন্দি করার ফলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন কাঁপতে শুরু করলো। গাছে ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে গেল। গাছ ফল দেওয়া বন্ধ করে দিল। পাখিরা গান গাওয়া বন্ধ করে দিল। তখন দেবতারা সবাই মিলে সঙ্কটমোচন দেবাদিদেব শিবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার জন্য। সব শুনে শিব তখন দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তুমি প্রজাপতিকে বন্দি করলে?' তখন কার্তিকেয় শিবকে বললেন, 'যার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর থাকার কথা তিনিই কেন বলতে পারছেন না ওম্ শব্দের অর্থ? এরপর কার্তিকেয় এবার সরাসরি পিতা শিবকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি 'ওম'-এর উত্তর জানেন?' আশুতোষ শিব মুচকি হাসলেন। উলটে বললেন কার্তিকেয়কে, 'তুমি জানো'। কার্তিকেয় বললেন, 'আমি 'ওম্'-এর অর্থ বলতে পারি, তবে আমাকে আপনার গুরু মানতে হবে।' শিব বললেন, তথাস্তু, তুমি আমার গুরু।'

আমাদের হয়তো শুনতে বড্ড আশ্চর্য লাগছে। পুত্র গুরু আর পিতা শিষ্য! প্রকৃতপক্ষে দেবতা ও মনুষ্যকে 'ওম্' শব্দের অর্থ বা মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্যই মহাদেব শিবের এই লীলা— 'ওম্' শব্দের মধ্যে তিনটি অক্ষর আছে -- অ-উ-ম।

ওঁ সকল শব্দের জননী । যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ভাষারই হোক না কেন মুখ খুললেই 'অ' বেরিয়ে আসে। 'অ'-র সঙ্গে 'উ' আর 'ম' যোগ করলেই 'ওম' হয়ে যায়। মুখ খুললেই 'অ' এবং মুখ বন্ধ করলেই 'ম'। আর মাঝে 'উ'। এই জন্যই সব ভাষায় 'ওম' বিরাজ করছে। 'ওম' ঈশ্বরের প্রতীক। 'ওম' মানে সমস্ত গুণের প্রকাশ। 'ওম' মানে সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্। 'ওম' মানে ঈশ্বরের আরাধনা।

অনেকের ধারণা ওম হলো ব্রহ্মাণ্ডের কণ্ঠস্বর। ব্রহ্মাণ্ডে কিন্তু শব্দ শোনার উপায় নেই। কারণ সেখানে শব্দ বহন করার মতো কোনো বায়ু নেই। যদি ব্রহ্মাণ্ডে বায়ু থাকতো তাহলে শব্দের গর্জনে পৃথিবীতে মানুষ বা জীবজন্তুর থাকা অসম্ভব হতো। ব্রহ্মাণ্ডের কিছু জায়গায় গ্যাস রয়েছে, যার কারণে ধ্বনিতরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে। নাসা ২০২২ সালের আগস্ট মাসের ২২ তারিখ ব্লেক হোল-এর সাউন্ড রেকর্ড করেছে। পৃথিবী থেকে ২৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই ক্লাস্টারে গ্যাস ও প্লাজমার দ্বারা তৈরি সত্যিকারের

ধ্বনির খোঁজ পেয়েছে। এই ধ্বনিকেই অনেকেই ওম্ বলে মনে করছেন।

নাসা টুইটে জানিয়েছে, 'ব্রহ্মাণ্ডে কোনো ধ্বনি নেই— এই ধারণা ভুল। তবে এমন ধারণার উৎপত্তির পেছনের মূল কারণ হলো মহাকাশের বেশিরভাগ স্থানে শূন্যতা আছে যা শব্দ তরঙ্গের প্রবাহের কোনো উপায় প্রদান করতে পারে না। একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে এত বেশি গ্যাস রয়েছে যে আমরা সত্যিকারের ধ্বনিকে বন্দি করে ফেলেছি। এখানে শব্দটি অ্যামপ্লিফাই করা হয়েছে এবং অন্যান্য ডেটার সঙ্গে মিশ্রিত করেই ব্ল্যাক হোলের সেই শব্দ শোনা গিয়েছে।' এটাকে অনেকেই ওম্ ধ্বনির মতোই শব্দ বলছেন। আজ নাসা দাবি করেছে যে মহাকাশে ধ্বনি আছে। কিন্তু ভারতের ঋষিরা সেই প্রাচীনকালেই এই ধ্বনির খোঁজ পেয়েছিলেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা কত উন্নত ছিলেন। কিন্তু ভারতেরই কিছু সেকুলার নামধারী বিদেশি মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি বা প্রাচীন ঋষি-মুনিদের উন্নত চিন্তাভাবনাকে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বিদেশিদের কথা বিশ্বাস করে বা আস্থা রাখে।

ওম্ জপের সময় বা উচ্চারণের সময় মাথার তালুতে হাত রাখলে অনুভব করা যায় এক ধরনের কম্পন যা আমাদের শরীর ও মনকে শান্ত করে তোলে। কারণ মানুষের মাথা বা মস্তিষ্ক হলো চালনাশক্তির আধার। এই মস্তিষ্ক যদি শান্ত, সুস্থ ও সবল থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শরীর ও মনও শান্ত, সুস্থ, সবল থাকে। ওম্ জপ করার ভালো সময় হলো সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা। তবে ওই সময়েই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সুবিধা মতো যে কোনো সময় করলেই হবে।

**ওঁ জপ করার উপকারিতা :**

(১) নিয়মিত ওঁ উচ্চারণ করলে গলায় একটি কম্পনের সৃষ্টি হয়, ফলে আমাদের শরীরে থাইরয়েডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেহেতু আমাদের গলায় থাইরয়েড গ্রন্থি রয়েছে, কাজেই কম্পনের ফলে এই হরমোনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(২) সারাদিন নানা কাজের ফলে শরীরে ও মনে চাপের সৃষ্টি হয়, যা খুব স্বাভাবিক। তবে এই চাপের বা ধকলের পরিমাণ বেড়ে গেলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। নিয়মিত ওঁ উচ্চারণে আমাদের স্ট্রেস বা ধকল অনেকটা কমে। শুধু তাই নয়, আমাদের শরীর ও মন দুটোই ডিটক্স হয়।

(৩) ওঁ উচ্চারণ করার ফলে আমাদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয় এবং প্রতিটি স্নায়ুতে সমানভাবে রক্তপ্রবাহ বজায় থাকে। যাদের হাই ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্ত চাপের সমস্যা রয়েছে তাদের অবশ্যই সারাদিনের মধ্যে অন্তত ১০ মিনিট ওঁ জপ করা উচিত বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

(৪) আজকাল অনেকের মধ্যেই একটা মানসিক অস্থিরতা বা উদ্বেগ দেখা যায়। তার নানা কারণ হতে পারে। যার মধ্যে হাইপারটেশন বা অ্যাংজাইটি বা মানসিক অস্থিরতার সমস্যা রয়েছে। এই সকল ব্যক্তি ওঁ উচ্চারণ করে মন শান্ত করতে পারেন।

(৫) যাদের ইনসমনিয়া বা অনিদ্রা রোগ আছে তারা নিয়মিত ঘুমোবার আগে চোখ বন্ধ করে ৫ মিনিট ওঁ উচ্চারণ করুন, এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বা প্রবাহ স্বাভাবিক হবে এবং ঘুমও আসবে। যদি কারো বসে ধ্যান করতে অসুবিধা হয় তবে তারা শুয়ে ধ্যান করলেও হবে। দেখা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুম চোখের পাতায় নেমে আসবে। হয়তো-বা কোনোদিন ধ্যান একটু বেশি করতে হবে আবার কোনোদিন ধ্যান একটু কম করলেই চোখে ঘুম নেমে আসবে। তবে ঘুম আসবেই, তা নিশ্চিত।

(৬) যদি কারও মন কোনো কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে দুই আঙুলে দুটি কানের লতি বন্ধ করে মুখ না খুলে অর্থাৎ মুখ বন্ধ করে এবং চোখ বন্ধ করে ২০ থেকে ৪০ বার ওঁ উচ্চারণ করলে ধীরে ধীরে শরীর ও মন দুটিই শান্ত হতে থাকবে। তার উত্তেজনা প্রশমিত হবেই হবে। হয়তো বেশি উত্তেজিত হলে শান্ত হতে বেশি সময় লাগবে।

অনেকেই বলে থাকেন যে তারা নাকি সকালে ঘুম থেকে উঠেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন নানান কাজে। তাদের কাছে ওঁ উচ্চারণ করে ধ্যান করার একদম সময় নেই। যারা একথা বলেন তাদের কাছে শুধু এতটুকুই বলবো যে সারাদিন কাজের ব্যস্ততার মধ্যে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় বের করে ওঁ জপ করে দেখুন, সময়ের মধ্যে আপনার কাজগুলি আরও সুন্দর ও সুচারু ভাবে সম্পন্ন হবে। শরীর ও মনও সুস্থ , শান্ত ও প্রফুল্ল থাকবে। মুনি-ঋষিরা কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেন এই ওঁ ধ্যান করেই। ও আমাদের শুধু আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করে তা কিন্তু নয়, এটি আমাদের নানা শারীরিক ও মানসিক সমস্যাও দূর করতে খুবই সাহায্য করে। ওঁ উচ্চারণ করলে বা কানে শুনলেও আমাদের শরীরে ও মনে এক ধরনের ইতিবাচক এনার্জি বা শক্তি তৈরি হয়, যা আমাদের সারাদিনের ধকল সহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করে, একই সঙ্গে শরীরকেও চাপমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। তবে যাদের ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিতে বা সনাতন সংস্কৃতিতে আস্থা কম এবং বিদেশি সংস্কৃতিতে আস্থা বেশি তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম।

*— **কানু রঞ্জন দেবনাথ***

*সূত্র : উইকিপিডিয়া - মুক্ত বিশ্বকোষ*

# বর্ষপ্রতিপদ ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা
# ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

**সরোজ চক্রবর্তী**

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাছে বর্ষপ্রতিপদ দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৮৮৯ সালের বর্ষপ্রতিপদের দিনে নাগপুরে এক বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের দাসত্বের ফলে যে হিন্দু জাতি তার গৌরবময় সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ইতিহাসকে ভুলতে বসেছিল, ইতিহাস বিস্মৃত হওয়ার কারণে, বিদেশিদের প্রভু রূপে স্বীকার করেছিল, সেই জাতিকে তিনি সংগঠিত করার এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেবল মন্ত্রই দিলেন না— সংগঠনের মন্ত্রস্বরূপ শাখা পদ্ধতির প্রণয়নও করলেন।

প্রাচীনকালে ভারতীয়দের পৌরুষ, রাজ্য, স্বাধীনতা, সম্পদ প্রভৃতি সবকিছুই ছিল কিন্তু একাত্মতা, পরিপূর্ণ স্নেহ ও অনুশাসন যুক্ত সংগঠনের অভাবেই ভারতবাসী পরাধীন হয়। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ডাক্তারজী তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণে। ভারতমাতার সেবা করার জন্য তিনি কৈশোরে চিরকৌমার্য ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন সেই প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর স্কুলজীবনেই। স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি তাঁর সহপাঠীদের সংগঠিত করে 'বন্দেমাতরম ধ্বনি' উচ্চারণ করেছিলেন ইংরেজ পরিদর্শকের সামনে। দক্ষ সংগঠকের মতো তিনি এই ধ্বনি দিয়ে সকল ছাত্রের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণের কাজে সফল হয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম ধ্বনি' তোলার জন্য শাস্তি হিসেবে পরবর্তীতে তিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একে অপরের মধ্যে যখন হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়, তখন তা থেকে এক অমোঘ শক্তি সৃষ্টি হয়। তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝেছিলেন মানুষের মনে ত্যাগের বীজ বপন করতে পারলে সেই মানুষ অন্যজনের অন্তরেও একইভাবে ত্যাগরূপ অগ্নি প্রজ্বলন সম্ভব। এভাবেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রত্যয়ী লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের সংগঠন গড়ে উঠবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হিন্দু জাতীয়তার ভিত্তিতেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হবে।

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছোটো-বড়ো বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন। স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বদা দেশমাতৃকার প্রতি সমর্পিত ছিলেন তিনি। যারা বলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে সঙ্ঘ কোনো ভূমিকা পালন করেনি, তারা এই মহান দেশপ্রেমিকের কর্মধারা না জেনেই মন্তব্য করেন।

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বঙ্গপ্রদেশ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন সংগঠন শাস্ত্রের পাঠ। সেই কারণেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। পড়াশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলকাতায় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করার সুবাদে এবং বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ থাকার কারণে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন।

তিনি অত্যন্ত গরিব পরিবারের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। কারুর কাছে হাত পাতার রুচি তাঁর ছিল না। থাকা-খাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর জীবনে কখনও আসেনি। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সমস্যাকে আনন্দের সঙ্গে সমাধান করতেন। ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গের বিপ্লবীদের সঙ্গে মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক হয়ে গিয়েছিলেন। 'কোকেন' ছদ্মনামে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলত।

দামোদরের ভীষণ বন্যার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তিনি সেবা কাজেও গিয়েছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন যুবক কেশবের সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠনকে জহুরির চোখ দিয়ে পরখ করেছিলেন তিনি। এরপর ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন তিনি তৈরি করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। জাতির জীবনে চরম হতাশা-নিরাশার সময় যুগপুরুষের জন্ম হয় যিনি ওই সমাজকে সঠিক দিশা নির্দেশ করেন, তেমনই ছিলেন ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি হিন্দুজাতির অতীত গৌরবের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দীর্ঘ পরাধীনতার কারণগুলি খুঁজে বের করে হিন্দুদের মধ্যে স্বাভিমান ও আত্মশক্তি জাগরণের কাজ করেছিলেন।

'ভারত হিন্দু রাষ্ট্র' এবং হিন্দুস্থান হিন্দুদেরই — একথা বলার ও উপলব্ধি করানোর জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন তিনি। বর্ষপ্রতিপদের পুণ্যতিথিতে তাঁর আবির্ভাব। তাঁকে শত শত প্রণাম।

# গ্রীষ্মের মরশুমে ব্রত ও আলপনা বঙ্গের শিকড় সংস্কৃতি

ড. কল্যাণ গৌতম

**দশপুতুল ব্রতের আলপনা**

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত পালিত হয় দশপুতুল নামে মেয়েলি ব্রত। তারই অনুষঙ্গে পিটুলিগোলা দিয়ে আঁকা হয় পুতুলি, যার পূর্বসূত্র আদিমমানবের গুহাচিত্র, যেখানে সহজ রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল মানবমূর্তির অবয়ব। আলপনা হয়ে তারই অনুবর্তন পরে প্রতিফলিত হয়েছে আজকের পুতুল নির্মাণ শৈলীতে। এই ব্রতের আলপনায় পৌরাণিক চরিত্র যেমন রাম-সীতা, হর-পার্বতী প্রভৃতি দশটি পুতুল আঁকা হয়। পুতুলে ফুল-দূর্বা ছুঁয়ে মনোবাসনার কথা প্রকাশ করা হয়—রামের মতো স্বামী চাই, সীতার মতো সতীসাধ্বী স্ত্রী হতে চাই ইত্যাদি। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি স্বস্তির জীবনকাঙ্ক্ষা এই ব্রতের উদ্দেশ্য। আলপনার কেন্দ্রে পদ্মের ঠাঁট যা নারী অঙ্গের প্রতীক, যেমন দশদল পদ্ম। আলপনার সীমানা জুড়ে কলামণ্ডনের নান্দনিকতা; চার কোণায় জড়ানো বৃত্ত, সংসারে জড়িয়ে থাকার আর্তি, জীবনানন্দের পূর্ণতা।

**পৃথিবীর ব্রতের আলপনা।**

বাঙ্গলার কুমারী মেয়েরা পরপর চার বছর ধরে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করে। সংসারের যাবতীয় মঙ্গল কামনাই মূল উদ্দেশ্য, এমনকী সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলও। উঠোন জুড়ে অথবা মেঝেতে পিটুলি গোলা দিয়ে আঁকা হয় পদ্মের বন। তার মধ্যে আঁকা হয় ধরিত্রীমাতা বা পৃথিবীদেবী। পুজোর উপচার ও উপকরণগুলি মন্ত্র পড়ে তিনবারের জন্য ঢেলে দেওয়া হয় আলপনার উপর। যেন পৃথিবী শান্তি পায়, অসুখ দূর হয়, মানুষও সুখী হয়।

**বসুধারা ব্রতের আলপনা।**

চৈত্র সংক্রান্তির দিনটি থেকে শুরু হয় বসুধারা ব্রত। গ্রীষ্মের চরম দাবদাহকে মনে রেখেই এই ব্রত। গৃহাঙ্গনে রোপিত গাছগুলিকে সূক্ষ্ম জলের ধারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার এক হিন্দুব্রত ও আচার। 'বসুধারা' মানে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর জল-সম্পদের স্রোত। বিবাহ উপলক্ষ্যে সনাতনী হিন্দুর ঘরের দেওয়ালে আঁকা হয় সিঁদুরবিন্দু-সহ বিয়ের পাঁচটি অথবা সাতটি স্রোত, তাকেও বসুধারা বলে। বসুধারা কথাটির মধ্যে রয়ে গিয়েছে প্রবাহের অনুভূতি।

ভারতের নারীরা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চৈত্র সংক্রান্তি থেকে টানা একমাস তুলসীমঞ্চে তুলসীধারার ব্যবস্থা করেন। একটি মাটির হাঁড়িতে তলায় ছোটো একটি ফুটো করে, তাতে পলতের কাপড় প্রবেশ করিয়ে অতি ধীর ধারায় সেচের বন্দোবস্ত করেন তারা, একে বিন্দুপাতি সেচ বলা যেতে পারে, ইংরাজীতে Drip Irrigation। ভারতীয় নারী যে বসুধারা ব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে স্নান সেরে সেই ঝারায় জল ঢালেন এবং তুলসী পূজা করেন তাও তুলসী নামক এক পবিত্র ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রতি ধন্যবাদাত্মক চিন্তন।

বসুধারা ব্রতে নারী আবৃত্তি করেন, 'তুলসী তুলসী নারায়ণ/তুমি তুলসী বৃন্দাবন / তোমার শিরে ঢালি জল / অন্তকালে দিও স্থল।' যেন জীবনকালে এ এক মহার্ঘ ভেষজ আর অন্তিমকালেও জীবনের মায়াজাল থেকে মুক্তির মহৌষধি; বাঙ্গলার ব্রতেও তারই পুণ্যপূজন। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল 'এষা' কাব্যগ্রন্থে লিখছেন, ''তোমার নিঃশ্বাসে / সর্বরোগ নাশে / যায় দুঃখ পলাইয়া।'' নানান ব্যাধিতে বনবাসী কৌম সমাজ তুলসীর ব্যবহার করে থাকে; কখনো এর ব্যবহার সর্দি-কাশিতে, কখনো লিউকোডারমা-র চিকিৎসায়, কখনো দাদের ক্ষত দূর করার জন্য, কখনো-বা ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বরনাশক রূপে।

বসুধারা ব্রতের উদ্দেশ্য বসুধা বা পৃথিবীকে উর্বরা এবং শস্য-সবুজ করে তোলা। ফসলের জন্য জল চাই, জলের জন্য বৃষ্টি চাই, বৃষ্টির জন্য মেঘ। বঙ্গদেশকে মেঘালয় করে তোলার কামনার নামই বসুধারা ব্রত। বসুধারা ব্রতের আলপনায় তুলসীমঞ্চের ঠাঁট-সহ তুলসীগাছ আঁকা হয়। আর আঁকা হয় স্বস্তিক চিহ্ন এবং তুলসীমাতার ছবি।

□

# উৎসবের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত জীবনপদ্ধতিকে প্রচারিত করে হিন্দু নববর্ষ

**পিন্টু সান্যাল**

একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় গণিত শাস্ত্রগুলির অনুবাদ পার্সিয়া হয়ে আরবে পৌঁছায় 'হিসাব-আল-হিন্দ'। অর্থাৎ 'হিন্দের হিসাব' নামে। হিসাব বা গণনা কোনো বিশেষ স্থানের হয় না। গণিতের নিয়মগুলো স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ ও শাশ্বত। তাহলে কোন অনুবাদক 'হিন্দ' বিশেষ্য ব্যবহার করেছিলেন? কারণ এই জ্ঞানের জন্ম হয়েছে যে মাটিতে, যে সংস্কৃতিতে, সেই সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। আলবিরুনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বকে পরিচিত করাতে 'হিন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার 'তারিখ-আল-হিন্দ' গ্রন্থে।

বহিরাগত আক্রমণকারী হোক বা পরিব্রাজক, সবাই এই দেশকে 'হিন্দুস্থান' বলে বিশেষিত করেছে আর অধিবাসীদের 'হিন্দু' হিসেবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতবর্ষের রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস জানাতে গিয়ে লিখলেন 'হিন্দু রসায়ন'—সে শুধু ভারতবর্ষের রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস নয়, বরং বিশ্বের রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ভাষার ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথম অধ্যায়েই ভারতবর্ষের নাম আসাটা অনিবার্য আর সেই জ্ঞানের জন্মাদাতা সংস্কৃতি হিসেবে 'হিন্দু' বিশেষ্য। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় তাই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ না আসাটা অসম্ভব। 'হিন্দু' তাই নামবাচক শব্দ থেকে পরিণত হয়েছে 'গুণবাচক' শব্দে অর্থাৎ বিশেষণের। কী গুণ? হিন্দু অর্থে বোঝায় এমন একটি সভ্যতার সূচনাকারী জাতি যারা বিজ্ঞানকে জীবনপদ্ধতির অংশ করেছে। বিশ্বকে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে স্থান দেওয়ার, শিক্ষা দেওয়ার কাজ এখনো বাকি বিশ্বজননী ভারতবর্ষের।

কালপঞ্জি আমাদের সকলের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দৈনন্দিন জীবনে কালপঞ্জি ছাড়া একটি দিন যাপন কল্পনার বাইরে। আমরা বর্তমানে যে কালপঞ্জি ব্যবহার করি তাকে পোপ গ্রেগরির নামানুসারে 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার' বলা হয় । কিন্তু, এই ক্যালেন্ডারটি কি বিজ্ঞানসম্মত? ইংরেজিতে 'ডেকা' শব্দের অর্থ দশ কিন্তু 'ডিসেম্বর' বছরের দ্বাদশতম মাস; ইংরেজিতে 'অক্টো' কথার অর্থ আট কিন্তু অক্টোবর কি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস? মাসের দিনসংখ্যা কখনো ৩০, কখনো ৩১, আবার কখনো ২৮ বা ২৯। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আবদারে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১ দিন কেটে জুলাই মাসে দেওয়া হয়েছিল। আবার পরের মাস আগস্ট ৩১ করতে ফেব্রুয়ারি মাসেই কোপ মারেন অগাস্টাস সিজার। কোথায় বিজ্ঞান? কোথায় কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা? 'দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানমনস্কতা'র কয়েক পাতা জুড়ে রচনা পড়ানোর সময় দৈনন্দিন জীবনে এতো বড়ো অবৈজ্ঞানিকতা ছোটো থেকে আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

বিজ্ঞান খুঁজতে হলে দেখতে হবে ভারতীয় কালপঞ্জিকে। মাসের নাম বৈশাখ কেন? কারণ সেই মাসে পূর্ণিমার চাঁদ থাকে বিশাখা নক্ষত্রের

কাছে। উৎসবের নামের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সেইদিনে চাঁদের দশা, যেমন—রামনবমী, গুরুপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, শিবচতুর্দশী, অরণ্যষষ্ঠী। বছরের দিনসংখ্যা মাসের দিনসংখ্যার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের পর্যাবৃত্ত গতির গাণিতিক গণনা আছে। একটি জাতি কোনো বৈদেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করে শাসন ক্ষমতা দখল করলেই সেই জাতিকে 'স্বতন্ত্র' বলা যাবে না যতক্ষণ না তাঁর সমাজব্যবস্থা তাঁর নিজের পদ্ধতিতে চলছে বা 'স্ব' তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে শিক্ষা ও পদ্ধতি নেওয়া যেতেই পারে কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার না করে নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি— সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা পেতে ভুলে গেছি।'

কালগণনা একটি জনগোষ্ঠীর সভ্যতা হিসেবে গণ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত। যে পুরাতন সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রে কালগণনার কোনো ইতিহাস জানা যায়, তাদের মধ্যে এখন শুধুমাত্র ভারতবর্ষই টিকে আছে। মায়া, ইনকা, মিশরীয় সভ্যতা এখন ইতিহাসের পাতাতেও হারিয়ে যেতে বসেছে। একটিমাত্র মত, একটিমাত্র পথ, একটিমাত্র উপাসনার ধারণা থেকে জন্ম নেওয়া 'Civilization' -এর ধারণা প্রাচীন সংস্কৃতির গভীরে লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞানমনস্কতাকে বুঝতে পারেনি বা চায়নি।

প্রাচীন ভারতের সম্পদশালী হওয়ার পেছনে দুটো কারণ ছিল, এক, কৃষি ও অন্যটি বৈদেশিক বাণিজ্য। এই দুই ক্ষেত্রেই সফলতার জন্য একটি ভালো কালপঞ্জীর প্রয়োজন ছিল। কৃষিক্ষেত্রে বর্ষাকাল নির্ণয়ের জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে নেভিগেশনের জন্য। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিশালী অতীত প্রমাণ করে যে এই দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে ছিল। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া একটি ভালো কালপঞ্জি নির্মাণ করা সম্ভব হতো না আর ভালো কালপঞ্জি ছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সফলতা অলীক কল্পনা ছিল। যদিও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা এই সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ কোনোদিন করেননি। তাইতো তাদের লেখায় বিশ্ব ভারতবর্ষের কাছে কতটা ঋণী তা প্রকাশ পায় না। ভারতবর্ষ অনেক বড়ো দেশ। তাই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী কালপঞ্জী পরিবর্তন করতে হতো আর তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একাধিক পঞ্জিকা ছিল। মিশর থেকে গ্রিস আর গ্রিস থেকে রোমানরা যে ক্যালেন্ডার পেয়েছিল সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ইস্টারের সঠিক দিন নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দিলে পোপ গ্রেগরি ক্যালেন্ডার সংশোধনে উদ্যোগী হন।

ইউরোপের বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী হওয়ার স্বপ্ন সঠিক ন্যাভিগেশনের পদ্ধতি ছাড়া এতদিন অধরাই ছিল। নেভিগেশনের প্রথম পদক্ষেপ হলো সমুদ্রে অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা। ১৭০৭ সালে এক সামুদ্রিক অভিযানে ব্রিটেনের ২০০০ জন নিখোঁজ হয়ে যায়। ১৭১৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নেভিগেশনের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ভাস্কো-দা-গামা ও কলম্বাস তা জানতো না। ভাস্কোকে একজন ভারতীয় নাবিক কনক সমুদ্রপথ দেখিয়ে ভারতে এনেছিলেন এবং কলম্বাস ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এই হচ্ছে সেই সময়কার ইউরোপের বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা! তাই পোপ গ্রেগরির ক্যালেন্ডার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পেছনে অন্যতম কারণটি হলো সমুদ্রে সঠিক অক্ষাংশ নির্ণয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যে ইউরোপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু সেই ক্যালেন্ডার সংশোধনের জন্যেও যে গণিতের জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তার হদিশ ভারতবর্ষ থেকেই পেতে হয়েছিল পোপ গ্রেগরিকে তার এক জেসুইট গুপ্তচর ক্লভিয়াসের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর ভারতের 'স্বতন্ত্রতা'র লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু তার গতি ছিল মন্থর। ১৯৫২ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে Calendar Reform Committee গঠিত হয়। তার আগে ডঃ মেঘনাদ সাহা ১৯৩৯ সালে 'Science & Culture' পত্রিকায় 'Need to Reform the Indian Calendar' শিরোনামে একট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ২২শে মার্চ, ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের নির্দেশে 'শক-সংবৎ'-কে ভারতবর্ষের জাতীয় ক্যালেন্ডারের তারিখের সঙ্গে শক-সংবতের তারিখ উল্লেখ করার আদেশ দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে নক্ষত্র বর্ষ ব্যবহার করে বিভিন্ন কালপঞ্জিকার প্রচলন আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে সৌর মাসের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক কালপঞ্জিকা প্রচলিত। চান্দ্র মাসের উপর ভিত্তি করে দুটি জনপ্রিয় কালপঞ্জিকা হল বিক্রম সংবৎ ও শক সংবৎ।

বিক্রম সংবতের সাল গণনা শুরু হয় উজ্জয়িনীর রাজা চন্দ্রগুপ্তের (যিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন) সময় থেকে (৫৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) আর শক সংবতের গণনা শুরু হয় শক রাজত্বের সময় থেকে।

শকরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত ছিল। বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করার পর 'বিক্রম সংবৎ' শুরু করেন। তাই 'বিক্রম সংবৎ' পদ্ধতির সঙ্গে ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের জাতীয় ক্যালেন্ডার 'শকসংবৎ' -এ ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে বিক্রম সংবতে প্রতি মাসের দিনসংখ্যা চাঁদের দশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতি। আর বিক্রম সংবৎ অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন চৈত্র শুক্ল প্রতিপদের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যভিষেক, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের মতো ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িয়ে আছে।

তাই 'বিক্রমসংবৎ'কে 'হিন্দু নববর্ষ' হিসেবে পালন করার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক জীবনপদ্ধতি ও অপরাজেয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানকে সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিলেও শুধুমাত্র যন্ত্রনির্ভরতাকেই বিজ্ঞানমনস্কতা হিসেবে মেনে নেওয়ার কারণ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে পশ্চিমি বিশ্ব এগিয়ে থাকলেও জীবনপদ্ধতিতে বিজ্ঞানকে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এগিয়ে আর তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ কালপঞ্জি। মৌলিক বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যার জন্য পশ্চিমি বিশ্ব ভারতবর্ষের কাছে ঋণী নয়। এখন শুধুমাত্র ইউরোপ-আমেরিকার বৈভব যদি, সবক্ষেত্রেই আমাদের পরানুকরণে অভ্যস্ত করে তাহলে তা ভারতীয় হয়েও ভারতীয়ত্বকে চিনবার ব্যর্থতা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে হিন্দু নববর্ষ বা বর্ষ প্রতিপদ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সনাতন প্রবৃত্তিকেই সদাজাগ্রত রাখতে চায় যা ভারতীয় হিসেবে আমাদের বিজ্ঞান সাধনা ও উৎসবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জীবনপদ্ধতিকে প্রচারিত করার প্রয়াস। □

# হিন্দু নববর্ষ যুগাব্দ শুরু হয় চৈত্র মাসেই

**সাধন কুমার পাল**

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষে যে যুগাব্দ গণনা শুরু হয়েছিল তা এই দিনটি থেকেই। এবার শুরু হতে চলেছে ৫১২৬ যুগাব্দ। আবার উজ্জয়িনীর সম্রাট অত্যাচারী শকদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে 'শকারি বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে 'বিক্রম সংবৎ' প্রবর্তন করেন এই দিন থেকেই। এবার ২৯৮১ বিক্রমাব্দের সূচনা হবে।

হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, হিন্দু বছরের চৈত্র মাসটি খুবই বিশেষ কারণ এই মাসটি হিন্দু নববর্ষের প্রথম মাস। হিন্দু নববর্ষ শুরু হয় চৈত্র মাস থেকে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিকে হিন্দু

নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে ধরা হয়। এছাড়াও এই তারিখে চৈত্র নবরাত্রিও শুরু হয়। চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথিকে বলা হয় বর্ষ প্রতিপদ, যুগাদি ও গুড়িপদওয়া। সারা বিশ্বে ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাস থেকে নতুন বছর শুরু হলেও বৈদিক হিন্দু ঐতিহ্য ও সনাতন কাল গণনায় চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে নতুন বছর শুরু হয়। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে ব্রহ্মা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তাই হিন্দু বিশ্বাসে এই দিনেই নতুন বছর শুরু হয়।

সকলের মনে এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগছে যে চৈত্র মাস, যা হিন্দু নববর্ষের প্রথম মাস, হোলি উৎসবের পর শুরু হয়। অর্থাৎ ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথির পর চৈত্র কৃষ্ণ প্রতিপদ শুরু হয়, তথাপি নতুন হিন্দু নববর্ষ পালিত হয় ১৫ দিন পরে। সর্বোপরি, এর পিছনে যুক্তি কী? আসলে, চৈত্র মাস শুরু হয় হোলির দ্বিতীয় দিনে, তবে এটি কৃষ্ণপক্ষ। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত ১৫ দিন স্থায়ী হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের এই ১৫ দিনে চাঁদ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার কারণে পুরো আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়। সনাতন ধর্মের ভিত্তি সর্বদাই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়া অর্থাৎ তমসো মা জ্যোতির্গময়। এই কারণে, চৈত্র মাসের শুরুর ১৫ দিন পরে যখনই শুক্ল প্রতিপদ আসে তখনই হিন্দু নববর্ষ পালিত হয়। অমাবস্যার পরের দিন শুক্লপক্ষের কারণে চাঁদ প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়, যার কারণে এটি অন্ধকার থেকে আলোতে পরিবর্তিত হয়। চৈত্র মাসের প্রতিপদ তিথিতে মহান গণিতবিদ ভাস্করাচার্য সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন, মাস ও বছর গণনা করে হিন্দু পঞ্জিকা রচনা করেছিলেন। এই তারিখ থেকে নতুন পঞ্জিকার শুরু হয় এবং সারা বছর ধরে উৎসব, উদ্‌যাপন এবং আচার অনুষ্ঠানের শুভ সময় নির্ধারণ করা হয়।

পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, এই দিনে ব্রহ্মা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। এ কারণেও চৈত্র প্রতিপদ তিথির এত গুরুত্ব। এর সঙ্গে এটিও বিশ্বাস করা হয় যে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে ভগবান শ্রীরাম বানররাজ বালিকে হত্যা করে সেখানকার মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সেই সময়ের সমাজ এই মুক্তির ঘটনা উদ্‌যাপন করেছে এবং ঘরে ঘরে পতাকা উত্তোলন করেছে। চৈত্র মাস মার্চ- এপ্রিল মাসে পড়ে। এই দিনটিকে মহারাষ্ট্রে গুড়িদওয়া এবং অন্ধ্র প্রদেশে যুগাদি উৎসব হিসেবেও পালিত হয়। চৈত্র প্রতিপদ তিথিতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্তৃক বিক্রম সংবতের সূচনা, ভগবান ঝুলেলালের জন্মবার্ষিকী, চৈত্র নবরাত্রির সূচনা হয়। চৈত্র প্রতিপদ নবরাত্রিতে শক্তির আরাধনা ও পূজা করা হয়। এতে মা দুর্গার নয়টি ভিন্ন রূপের পূজা করা হয়। নবমী তিথিতে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামের জন্মতিথি পালিত হয় এবং তারপর চৈত্র পূর্ণিমায়, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত হনুমানের জন্মতিথি পালিত হয়। শাস্ত্র অনুসারে, চারটি যুগের মধ্যে এই তিথিতে অর্থাৎ চৈত্র প্রতিপদে প্রথম সত্যযুগ শুরু হয়েছিল। এই তারিখটিকে সৃষ্টিচক্রের সূচনা এবং প্রথম দিন হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। মহর্ষি দয়ানন্দও চৈত্র মাসের প্রতিপদ তিথিতে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই তিথিতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ারের জন্ম হয়। □

# উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ আরসিবি-র

**নিলয় সামন্ত**

দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে চলতি বছর মহিলাদের আইপিএল জিতেছে আরসিবি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি জেতার পাশাপাশি পুরস্কারমূল্যও পেয়েছেন স্মৃতি মন্ধানারা। ফাইনালে হারলেও দিল্লিও পুরস্কারমূল্য বাবদ খুব কম টাকা পায়নি।

ফাইনালে দিল্লির বিরুদ্ধে খেলা ছিল আরসিবির। প্রথমে ব্যাট করে ১১৩ রানে অল আউট হয়ে যায় দিল্লি। আরসিবির হয়ে শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ৪টি ও সোফি মলিনিউ ৩টি উইকেট নেন। জবাবে ৩ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে যায় আরসিবি।

বিরাট কোহলিরা পারেননি। ১৬ বছর ধরে আইপিএল খেলেও আরসিবি-র ছেলেরা ট্রফি জিততে পারেননি। মেয়েদের দল দ্বিতীয় বছরেই ট্রফি এনে দিল আরসিবিকে। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ (মেয়েদের আইপিএল) জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আর সেই ম্যাচ জেতালেন পশ্চিমবঙ্গের রিচা ঘোষ।

শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা। গত বছরও আরসিবির হয়ে খেলেছিলেন। এ বছর ১০ ম্যাচে ২৫৭ রান করলেন তিনি। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল ফাইনালে রিচার চার মেরে ম্যাচ জেতানো। ট্রফি জিতে রিচা বলেন, 'আমার খুব চাপ লাগছিল। ভয় করছিল। ক্রিজের উলটো দিকে থাকা এলিস পেরি আমাকে সাহায্য করে। গত বছরটা আমাদের ভালো যায়নি। এই বছর ফাইনালে উঠলাম ও জিতলাম। আমরা সে ভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এটা অনুশীলনের ফল। সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমরা উইকেটে বল রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি। পর পর উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর কম রানের লক্ষ্য হলে বেশির ভাগ সময় ম্যাচ শেষ ওভার পর্যন্ত গড়ায়। কখনও জিতে গিয়েছি মনোভাব আনা উচিত নয়।'

রিচার ব্যাটে এবারে একাধিক ম্যাচ জিতেছে আরসিবি। উইকেটের পিছনেও দলকে ভরসা দিয়েছেন। রিচার হাত ধরেই প্রথম ট্রফি পেল আরসিবি। দলের পূর্বতন মালিক বিজয় মাল্য বলেন, 'মেয়েরা ট্রফি এনে দিয়েছে। এবার ছেলেদের পালা। অনেক বছর ধরে অপেক্ষায় রয়েছি।'

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১১৩ রান করে দিল্লি ক্যাপিটালস। ৭ ওভারে ৬৪ রান তুলে নিয়েছিল দিল্লি। অষ্টম ওভারে প্রথমে আউট হন শেফালিব ভার্মা। তারপর আউট জেমাইমা রড্রিগেজ। চতুর্থ বলে বোল্ড এলিস ক্যাপসি। এক ওভারে তিন উইকেট তুলে দলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন মলিনক্স। ওই ধাক্কা সামলাতে পারেনি দিল্লি। তারপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। রানও তুলতে পারল না বেশি। ১১৩ রানে অল আউট হয়ে গেল দিল্লি। সোফি মলিনিউ ছাড়াও নজর কাড়েন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। একাই ৪ উইকেট তুলে নেন তিনি।

অল্প রানের লক্ষ্য মাথায় নিয়ে খেলতে নেমেও আরসিবি-কে লড়তে হলো শেষ ওভার পর্যন্ত। মন্ধানা (৩১) এবং সোফি ডিভাইন (৩২) মিলে ৪৯ রানের জুটি গড়েন। হাতে ৮ উইকেট থাকলেও বড়ো শট খেলতে পারলেন না এলিস পেরি এবং রিচা ঘোষ। শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন তাঁরা ম্যাচটিকে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য আরসিবির প্রয়োজন ছিল ৫ রান। তিন বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেন মন্ধানারা।

কিছুক্ষণ আগেই মহিলাদের আইপিএল জিতেছে দল। উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছেন সতীর্থরা। কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত। মুখে চওড়া হাসি থাকলেও উচ্ছ্বাস বেশি দেখাননি স্মৃতি মন্ধানা। পরে ট্রফি তোলার আগে নিজের থেকে বেশি দল ও সমর্থকদের কথা শোনা গেল তাঁর মুখে। আর সমর্থকদের কথা বলতে গিয়েই একটি লাইন বললেন মন্ধানা— 'ই সালা কাপ নামদু।'

দিল্লির মাটিতে ফাইনাল হলেও অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দেখে মনে হচ্ছিল আরসিবির সমর্থকই বেশি। এই কথা শোনা গিয়েছে মন্ধানার মুখে। আরসিবি অধিনায়ক বলেন, 'আমি একাই ট্রফি জিতিনি। গোটা দল জিতেছে। বেঙ্গালুরুর সবাই জিতেছে। সমর্থকদের আমি একটা কথা বলতে চাই। এই রকম সমর্থক কোনও দলের নেই। প্রত্যেক বার একটা কথাই শোনা যায়— 'ই সালা কাপ নামদে।' এবার বলা যাবে, 'ই সালা কাপ নামদু।' কন্নড় আমার প্রথম ভাষা নয়। কিন্তু সমর্থকদের এই কথাটা বলার ছিল।'

মন্ধানার এই কথার মানে কী? কন্নড় ভাষায় 'ই সালা কাপ নামদে' কথার অর্থ হলো, এই বছর কাপ আমরাই জিতব। প্রতিবার আইপিএলের সময় আরসিবি সমর্থকেরা এই স্লোগান দেন। কিন্তু প্রতি বছর হতাশ হতে হয় তাঁদের। এবার সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মন্ধানা বলেন, 'ই সালা কাপ নামদু', যার অর্থ এই বছর কাপ আমরাই জিতলাম। ▯

# দুই মূর্খ শিষ্য

এক গুরুর বহু শিষ্য ছিল। তারা পড়াশোনা, আশ্রমের কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে গুরুর সেবাযত্ন করত। তাদের মধ্যে দুজন ছিল যারা পরস্পরকে ভীষণ হিংসে করত। একজন যদি গুরুর ডান পা টিপে দিত তো অন্যজন গুরুর বাম পা টিপতে শুরু করত।এভাবেই একজনের গুরুর ডান পায়ের অধিকার এবং অন্য জনের গুরুর বাম পায়ের ওপর অধিকার জন্মে গেল। তারা এমনই মূর্খ যে এক-একটি পা'কেই গুরু মনে করত।

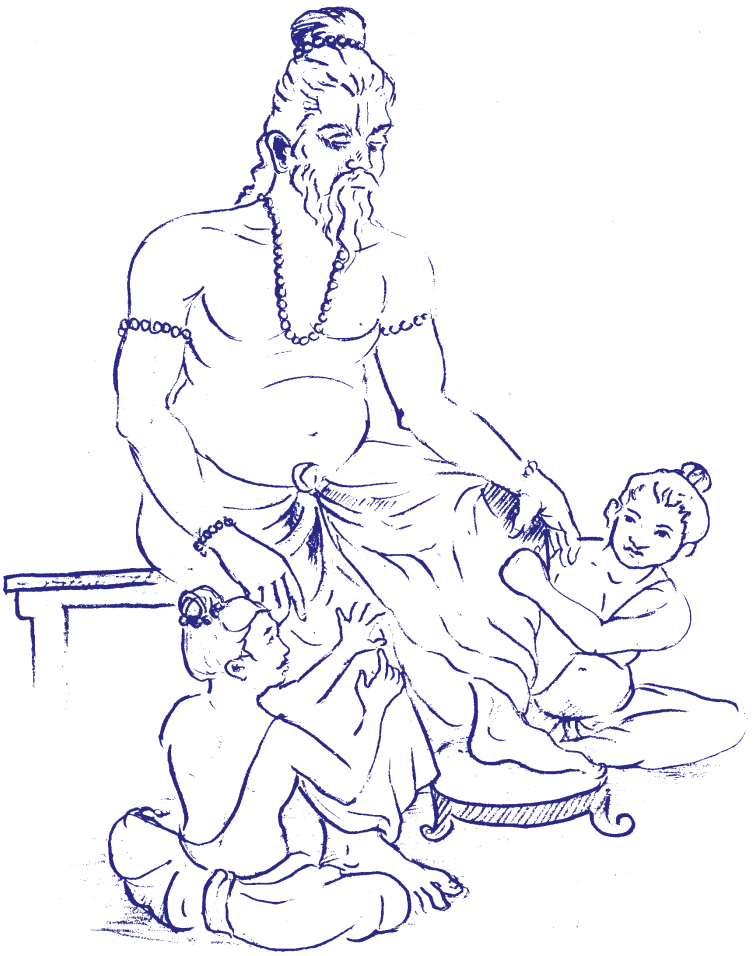

একদিন হলো কী, যে শিষ্যটি গুরুর ডান পদসেবা করত তাকে কোনো একটি কাজে অন্য এক গ্রামে যেতে হলো। অন্য শিষ্যটি যখন গুরুর বাঁ পদসেবার জন্য এল, তখন গুরু তাকে বললেন, দেখো, ও তো আজ এখানে নেই, তুমি ডান পা'টিও মালিশ করে দেবে। এই শিষ্যটি অন্য শিষ্যটিকে খুব হিংসে করত। তাই সে মনে মনে বলল, আজ তোমাকে মজা ধরাচ্ছি, তোমার ডান পা'টির আজ আমি দফারফা করে ছাড়বো। সে তখন গুরুর বাম পা'টি খুব ভালোভাবে, যত্ন করে মালিশ করতে শুরু করল, গুরু তো আবেশে চোখ বন্ধ করে আছেন। বুঝি একটু ঘুমিয়েও পড়েছেন। শিষ্যটি তখন সেই ফাঁকে একথান ইট এনে গুরু ডান পায়ে এমন আঘাত করল যে গুরুর ডান পা ভেঙে গেল।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গুরুদেব ছটফট করে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার শুনে অন্যান্য শিষ্যরা ছুটে এল। তারা দেখল, বোকা শিষ্যটি গুরুর ডান পা'টি ভেঙে ফেলেছে। তারা রেগে গিয়ে ওই বজ্জাত শিষ্যটিকে আচ্ছা করে মারতে শুরু করল। মার খেয়ে ছেলেটি কাঁদতে শুরু করল। তাকে কাঁদতে দেখে গুরুর মনে দয়া হলো। তিনি শিষ্যটিকে অন্যান্য শিষ্যের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

পরদিন গুরুর ডান পদসেবাকারী শিষ্যটি গ্রাম থেকে আশ্রমে ফিরে এল। এসেই গুরুর কাছে গিয়ে দেখে গুরুর ডান পা'টি ভাঙা। তাতে ব্যান্ডজ বাঁধা রয়েছে। সে ছুটে গিয়ে সতীর্থদের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে অন্য শিষ্যটি তার ওপর হিংসে করে গুরুর ডান পা'টি ভেঙে দিয়েছে।

সবকিছু শুনে সে খেপে উঠল। বলল, ঠিক আছে, ও কী ভেবেছে যে ও একাই পা ভাঙতে পারে! আমিও ওর বাম পা'টি ভেঙে ফেলব। এই বলে তে এক থান ইট কুড়িয়ে এনে খুব জোরে গুরুর বাম পায়ে আঘাত করল। গুরু আবার যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন।

চিৎকার শুনে আবার অন্য শিষ্যরা ছুটে এসে দেখল, এই শিষ্যটি গুরুর বাম পা'টিও ভেঙে দিয়েছে। তারা সকলে মিলে তাকে মারতে লাগল। শিষ্যটিকে মারের হাত থেকে বাঁচালেন গুরুদেব। তারপর দুই শিষ্যকেই সবার সামনে ডেকে বললেন, তোমাদের মতো মূর্খ শিষ্যের আমার দরকার নেই। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

দুই শিষ্যই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল। তারা মূর্খই থেকে গেল।

– পৃথ্বীরাজ সেন

(ছবি : বিদ্যুৎ)

## নদ-নদী পরিচয়

# উত্তরবঙ্গের নদ-নদী

গত কয়েকটি সংখ্যায় উল্লেখিত ছাড়াও এই নদীগুলি উত্তরবঙ্গের কোনো না কোনো জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে– তালমা, জলঢাকা, ডাহুক, ডুডুয়া, সঙ্কোশ, রায়ডাক, ফুলহার, ধরলা, রাম্মাম, শ্রীখোলা, লোধমা, রিয়াং, ছোটো রঙ্গিত, বড়ো রঙ্গিত, পম্পা, রঙ্গিয়ো, রঙ্গু, রাঙ্গাং, মাণ্ডিং, রংবি, রঙ্গিয়াক, খংখোলা, রতু, রিলিং, কাহিল, রিংরিয়াৎ, কলোক, মেচী, রংবং, পাইয়াংডং, পোসাম, বালাসন, পাচিম, সুলিয়াসি, দোধিয়া, মারমা, মতুয়া, রকতি, রুহমি, সিভক, মামঝা, চেঙ্গা, মুলিয়া, পন্থাবাড়ি, পঞ্চাই, লাচিও, কুরুনডাক,তপু, চৈয়াটি, দুমারিয়া, দুলদুল, কুয়োর্চি, রিংচিটাং, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, রাংপো, মেরং, রাসেল, রংবং, রেচি, রামবং, সাবুকতান, নুনচু, রাংলো,মহাকা, রিরিউং, ঋষিখোলা। (ক্রমশ)

## এসো সংস্কৃত শিখি-১৭

**সর্বত্র (সব জায়গায়)**

ঈশ্বর: সর্বত্র অস্তি। ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন।

ঈশ্বর: ক্বত্র অস্তি ? ঈশ্বর কোথায় আছেন?

**অভ্যাস করি–**

বায়ু: ক্বত্র অস্তি ?– বায়ু: সর্বত্র অস্তি।

আকাশ: ক্বত্র অস্তি ?–আকাশ: সর্বত্র অস্তি।

দুষ্ট: ক্বত্র অস্তি ?–দুষ্ট: সর্বত্র অস্তি।

পরিবশদূষণং – – ? পরিবশদূষণং সর্বত্র অস্তি।

সজ্জন: – – ? – সজ্জন: – অস্তি।

জীবনং – – ? জীবনং সর্বত্র অস্তি।

**প্রয়োগ করি–**

**সর্বত্র** দ্বারা দ্বিত্রাণি বাক্যাণি বদতু ।

সর্বত্রং কিং কিম অস্তি ?

ধূলি:, ধ্বনি:, অন্যায়:, আশা, আনন্দ:, বঞ্চনা, প্রাণা: ।

## ভালো কথা

# নতুন রাস্তা

প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। আমাদের স্কুলটা অনেক দূরে, তাই স্কুলবাসে যেতে হয়। স্কুল ছুটি হলে আবার আমরা বাসে বসলাম। বাস ছাড়বে তখন হঠাৎ খবর এল, রাস্তায় একটা বড়ো লরি আটকে পড়েছে। আসলে আমাদের স্কুলটা বড়ো রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে। একটা ছোটো রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। সেই রাস্তায় লরিটা আটকে ছিল। কী হবে কেউ বুঝতে পারছিল না। তখন প্রিন্সিপ্যাল স্যার বললেন, উলটো দিকের একটি রাস্তা দিয়ে অনেক ঘুরে বড়ো রাস্তায় যেতে হবে। সেই রাস্তা দিয়েই অন্য সব গাড়ি যেতে লাগল। আমাদের গাড়িও সেই রাস্তা ধরল। আমি এই রাস্তায় কোনোদিন যাইনি। কত সুন্দর গ্রাম। মাটির ছোটো ছোটো ঘর। দেখতে ছবির মতো লাগছে। আমাদের দেখে কেউ কেউ হাত নাড়ছে। কেউ পুকুরে স্নান করছে। কেউ কলের জলে বাসন মাজছে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। আমাদের সামনে দিয়ে একটা ট্রেন চলে গেল। খুব অ্যাডভেঞ্চার মনে হলো। তারপর আমাদের বাস বড়ো রাস্তায় উঠল। আমি বাড়ি এলাম। সেদিন আমার বোনের জন্মদিন ছিল। দিনটা খুব ভালো কাটল।

**দেবলীনা সরকার,** ষষ্ঠ শ্রেণী, নালাগোলা, মালদা।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| (১) ণ দ্ম ভূ প | (১) তা হি ল মা হি য় দু |
| (২) দ দ ত লি | (২) স্থি য় ষ্টি তি সৃ ল প্র |

**১৮ মার্চ সংখ্যার উত্তর**

(১) ঘরদুয়ার (২) ঘরজামাই

**১৮ মার্চ সংখ্যার উত্তর**

(১) ছেলেছোকরা (২) জীবনধারা

**উত্তরদাতার নাম**

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, ই.বি, মালদা। (২) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর। (৩) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর। (৪) বাবু মাহাতো, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

*With Best Compliments from -*

**A**
**Well wisher**

# গ্রীষ্মের চাষাবাদ

**ড. কল্যাণ চক্রবর্তী**

বাঙ্গলার বারমাস্যা গানে রয়েছে, 'চৈতে গিমা তিতা, বৈশাখে নালিতা মিঠা, জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল।' খোসপাঁচড়া তাড়াতে চৈত্রমাসে গিমাশাকের ব্যঞ্জন, বৈশাখে ডালেসেদ্ধ মিঠাপাটের ভাত। তা খেতে খেতেই চলে আসবে কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠ। জুটবে পাকা আমের মণ্ড দিয়ে জাউ-ভাত, দরিদ্র বাঙ্গালির সস্তায় পুষ্টিকর ভিটামিন সমৃদ্ধ আহার। এবার যাই কৃষিক্ষেত্রে গ্রীষ্মকালীন নানান ফসলচাষের আলোচনায়।

**পাট চাষ**

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিতাপাটের জলদি জাতগুলি বোনা সম্ভব। ফাল্গুনের শেষ থেকেই তা বপন শুরু হয়ে যায়। তবে তিতাপাটের প্রধান ফসল পরে বুনতে হবে। এই বপন পর্ব চলে পুরো চৈত্র মাস এবং বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু মিঠাপাট বোনা হয় একটু দেরিতে। মিঠাপাটের জলদি ফসল চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি অবধি বোনা যাবে। তার প্রধান ফসল বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা সম্ভব।

তিতা ও মিঠাপাটের জন্য বীজের হারে সামান্য পার্থক্য আছে। বিঘা প্রতি জমিতে তিতাপাটের জন্য ১ কেজি এবং মিঠাপাটে ৮০০ গ্রাম বীজ লাগে। বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হয়। প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম পরিমাণ কার্বেন্ডাজিম অথবা ২ গ্রাম থাইরাম মিশিয়ে দেন চাষিরা।

তিতাপাটের উন্নত জলদি জাত হল সোনালি। তিতাপাটের প্রধান ফসলরূপে শ্যামলি, সবুজসোনা ইত্যাদি জাত আছে। মিঠাপাটের উন্নত জলদি জাত যেমন চৈতালি তোষা। মিঠাপাটের প্রধান ফসলরূপে সুবর্ণ জয়ন্তী তোষা, বাসুদেব, নবীন ইত্যাদি বোনা যায়।

পাটের জমি তৈরি করতে শেষ চাষের সময় বিঘা প্রতি ১০-১২ কুইন্টাল জৈবসার মেশাতে হবে। আর দিতে হবে মোট নাইট্রোজেনের এক তৃতীয়াংশ। ফসফেট ও পটাশ সারের পুরো ভাগটাই সেই সঙ্গে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। তিতা পাটে বিঘা প্রতি ৮, ৪ এবং ৪ কেজি নাইট্রোজেন, ফসফেট আর পটাশ লাগে। মিঠাপাটে লাগে যথাক্রমে ৭, ৩ ও ৩ কেজি পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ। এই নাইট্রোজেনের এক-তৃতীয়াংশ শেষ চাষে দেওয়ার কথা।

যারা ফাল্গুন মাসের শেষদিকে তিতাপাট বোনার সুযোগ পেয়েছেন, তারা পাটের চারা বের হবার দু'সপ্তাহের মধ্যে চার ইঞ্চি তফাতে এক একটি গাছ রেখে বাকিগুলি তুলে ফেলুন, তাতে গাছের বৃদ্ধি ভালো হবে। এই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মাঝের ঘাসগুলিও নিড়ান দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। এছাড়া বীজ বোনার একদিন পর আগাছানাশক ফ্লুক্লোরোলিন ৪৫ শতাংশ (ব্যাসালিন) প্রতি লিটার জলে ৬ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে প্রতি বিঘার জন্য ২৭ লিটার ওষুধ-গোলা জল স্প্রে করলে আগাছার উৎপাত ঠেকানো সম্ভব।

**ডালশস্য চাষ**

**মুগ ঃ** প্রাক-খরিফ বা গ্রীষ্মকালীন মুগ চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা যায়। এই বীজ বোনার সূত্রপাত ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময় থেকে। ভালো জাত হচ্ছে সোনালি, পান্না প্রভৃতি। বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি বীজ লাগবে। বীজের সঙ্গে মেশাতে হবে নির্দিষ্ট প্রকারের জীবাণু সার রাইজোবিয়াম। জমি তৈরির সময় দিতে হবে বিঘা প্রতি ৩ কেজি নাইট্রোজেন বা ৭ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি ফসফেট বা ৩১ কেজি এসএসপি এবং ৫ কেজি পটাশ বা ৮ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ সার। আর দিতে হবে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সার।

মুগ বোনার তিন সপ্তাহ পর আগাছা দমন করতে হবে। তুলে ফেলতে হবে অতিরিক্ত ও দুর্বল চারা। বোনার একমাসের কিছু আগে একটি হাল্কা সেচ দরকার।

**কলাই :** চৈত্র মাসে প্রাক-খরিফ ফসল হিসেবে কলাই বোনা যায়। এই বোনার কাজ শুরু হয়ে যায় ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকেই। বীজ লাগবে বিঘাতে সাড়ে তিন কেজি (ছিটিয়ে বুনতে) থেকে তিন কেজি (সারিতে বুনলে)। বীজ শোধন করে নিতে হবে। এজন্য প্রতি

কেজি বীজে ২ গ্রাম পরিমাণ থাইরাম বা ২ গ্রাম পরিমাণ কার্বেন্ডাজিম মেশাতে হবে। কলাই-এর উন্নত জাতগুলি হল কালিন্দী, সারদা, বসন্ত বাহার, আজাত ইত্যাদি। বীজের সঙ্গে নির্দিষ্ট জীবাণু সার রাইজোবিয়াম মিশিয়ে বোনা ভালো। শেষ চাষের সময় মুগে সুপারিশকৃত সার প্রয়োগ জরুরি।

**কন্দ ফসল কচু :** বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল কচু লাগানোর সময়। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত কচু রোয়া করা যায়। কালী, ধলী ভালো জাত। প্রতি বিঘায় বীজ-কচু লাগবে ৭০ থেকে ১৪০ কেজি। ৬০ x ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে কচু লাগাতে হবে। বিঘা প্রতি ১৫, ২৫ এবং ৭ কেজ করে যথাক্রমে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অব পটাশ প্রাথমিক সার হিসাবে দিতে হবে। যারা চৈত্রমাসে কচু লাগাবেন তারা বৈশাখ মাসে (রোয়ার একমাস পরূ ১৫ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে দেবেন।

**ওল :** বৈশাখ মাস ওল লাগানোর সময় ঃ চৈত্রমাসেও লাগানো যায়। সাঁতরাগাছি, কাভুর প্রভৃতি ভালো জাত। বিঘায় ১২০ কেজি বীজ ওল লাগে। ৭৫x ৭৫ সেন্টিমিটার দূরে ওলের কন্দ লাগাতে হয়। প্রাথমিক সার হিসাবে বিঘায় যথাক্রমে ১৫, ৫০ এবং ২২ কেজি হারে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অব পটাশ লাগাবে। যারা চৈত্রমাসে ওল লাগাবেন তারা বৈশাখ মাসে (এক মাস বাদে) বিঘা প্রতি ১২ কেজি চাপান সার দেবেন।

**ঢ্যাঁড়শ :** ঢ্যাঁড়শ চাষের জন্য বৈশাখ মাস থেকে বীজ বোনা শুরু হয়। আষাঢ় মাস পর্যন্ত তা বোনা যায়। বীজের হার হেক্টর (সাড়ে সাত বিঘা) প্রতি ১০ কেজি; চারার দূরত্ব ৬০x ৪৫ সেমি অথবা ৬০x ৩০ গুথবা ৪৫x ৩০ সেমি। ০.২% ব্যভিস্টিন দ্রবণে ভিজিয়ে বীজ শোধন করলে ঢলে পড়া রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রতি হেক্টরে ৫০ থেকে ৭০ হাজার চারা থাকতে হয়। বীজ বোনার আগে হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২২ কেজি ফিউরাডন ৩ জি কীটনাশক দানা ছড়ালে নানান কীটশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

**লাউ-কুমড়ো :** বর্ষার লাউ পেতে হলে বৈশাখ মাসে বীজ বুনতে হবে। তা জ্যৈষ্ঠমাসেও বোনা যায়। দূরত্ব রাখতে হবে ১ মিটার ৮০ সেন্টিমিটার x ১ মিটার ২০ সেন্টিমিটার। লাউয়ের উন্নত জাত হলো পুসা সামার প্রলিফিক লং, পুসা সামার প্রলিফিক রাউন্ড, পুসা মঞ্জরি, পুসা মবীন, অর্ক বাহার ও নানান হাইব্রিড বা সংকর জাত। পাহাড়ি এলাকায় যারা চৈত্রমাসে লাউ ও কুমড়ো বুনবেন তারা বৈশাখ মাসে (বোনার এক মাসের মাথায়) প্রথমবার এবং জ্যৈষ্ঠমাসে (বোনার দু' মাস পর) দ্বিতীয় বার চাপান সার হিসেবে নাইট্রোজেন দেবেন। চাপান সার হিসাবে প্রতিবার হেক্টর প্রতি (সাড়ে সাত বিঘা) সাড়ে বারো থেকে পনেরো কেজি করে নাইট্রোজেন দিতে হবে।

**ফুলচাষ**

**রজনীগন্ধা :** বৈশাখ মাস রজনীগন্ধার কন্দ বা গেঁড়ো লাগানোর সময়। এই কাজ চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়। রজনীগন্ধায় সিংগল ও ডবল—এই দুই ধরনের ফুল দেখা যায়। দেশীয় বাজারে সিংগল জাতগুলির চাহিদা বেশি। ক্যালকাটা সিংগল জাত ছেড়ে ধীরে ধীরে প্রোজ্জ্বল, ফুলে রজনী, আর্কা নিরন্তর, শৃঙ্গার, শুভাষিণী, রাজতরেখা, স্বর্ণরেখা ইত্যাদি জাত চাষ করতে হবে। প্রতি বিঘায় তেত্রিশ হাজারের মতো কন্দ লাগবে। কন্দগুলি ২০x ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগাতে হবে। প্রতি ৬টি সারির পর একটি ফাঁকা সারি থাকলে তা পরবর্তী পরিচর্যায় সুবিধা হবে। মূল সার হিসাবে জমিতে বিঘাপ্রতি ২-৩ টন জৈব সার, ২২ কেজি ইউরিয়া, ৬২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ২৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ লাগবে। যারা চৈত্রের মাঝামাঝি কন্দ রোপণ করবেন তারা বৈশাখের একেবারে শেষে বিঘা প্রতি ২৫ কেজি ইউরিয়া অথবা ৬০ কেজি খোল প্রয়োগ করবেন। ফুলের গুণগত মান বাড়াতে ২% জিঙ্ক সালফেট স্প্রে করা দরকার।

**বেল ও জুঁই ফুল :** বৈশাখ মাস বেল ও জুঁইয়ের কাটিং বসানোর সময়। এই কাটিং বসানোর কাজ জ্যৈষ্ঠমাস অবধি চলবে। বেলফুলের ভালো জাত হচ্ছে রাই, মোতিয়া, ভরিয়া, চীনা, জাপানি প্রভৃতি। জুঁই ফুলের মধ্যে সিংগল ও ডবল জুঁই উল্লেখযোগ্য। বেলফুলের কাটিং লাগবে বিঘাতে সাড়ে ছয় হাজার; জুঁইয়ের ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই হাজার। ৪৫x ৪৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে বেল আর ৭৫x ৭৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে জুঁই লাগানো হয়। শেষ চাষের সময় বিঘা প্রতি ২ থেকে ৩ টন জৈবসার, ৩৩ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৪২ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। আষাঢ় মাসে (চারা লাগানোর দু মাস পর) বিঘা প্রতি ৩৩ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

**গো-খাদ্যের চাষ :**

গ্রামবাঙ্গলার একটি প্রচলিত কথা হলো 'গাই গোরুর মুখে দুধ'। তার মানে হলো গোরুকে ভালো খাওয়ালেই কেবল ভালো দুধ দেবে। ভালো খাবারের মধ্যে সবুজ গোখাদ্য বিশেষ উপযোগী। প্রচলিত ফডার বা গোখাদ্য জোয়ার ও ভুট্টা ছাড়া বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে বরবটি, প্যারাঘাস ও গড়গড়া বা কোয়েক্সের বীজ বোনার কাজ শুরু করা যাবে। বরবটি বোনা চলবে জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি; গড়গড়া আষাঢ় পর্যন্ত এবং প্যারাঘাস শ্রাবণের শেষ অবধি বোনা যাবে।

কোয়েক্স বা গড়গড়া এবং বরবটির ক্ষেত্রে ৩০x ১৫ সেমি দূরত্বে বীজ বুনতে হবে। বীজের হার বিঘা প্রতি যথাক্রমে ৫.৫ - ৬.৫ এবং ৪.৫ - ৫.৫ কেজি। প্যারাঘাসের কাটিং বসাতে হয়। ৬০x ৬০ সেমি দূরত্বে কাটিং লাগাতে হবে। এই হিসাবে বিঘায় প্রায় চার হাজারের মত কাটিং লাগবে। গড়গড়া, বরবটি ও প্যারাঘাসে বিঘা প্রতি নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার লাগবে যথাক্রমে ১৩ : ৬.৫ : ৪; ৩ : ৬ : ৩ এবং ১৬ : ৬.৫ : ৪ কেজি। ৫০ থেকে ৭০ দিনের মাথায় গড়গড়া। ৬০ থেকে ৭৫ দিনের মাথায় বরবটি এবং ৬৫ থেকে ৭৫ দিনের মাথায় প্যারাঘাসের ফসল নেওয়া যাবে। বেশ কয়েকবার ফসল নেওয়া যায়। বিঘা প্রতি সবুজ গোখাদ্যের ফলন গড়গড়ার ক্ষেত্রে প্রায় ৩৩ কুইন্টাল; বরবটিতে ৪০ কুইন্টাল এবং প্যারাঘাসে ২০০ কুইন্টাল পর্যন্ত। □

# বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক

# কীসের ইঙ্গিত?

**সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী**

বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করতে ভারতের অবদান অস্বীকার করা মানেই এক বিশাল সত্যকে অকৃতজ্ঞের মতো এড়িয়ে যাওয়া। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত পরম বন্ধু হিসেবে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছিল। সেটি আজ ইতিহাস। অস্ত্র, অর্থ, খাদ্য, সৈন্য, এমনকী স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত তৈরির জন্যও ভারত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিল। বন্ধু হওয়ার জন্য যা কিছু করা দরকার তাতে সামান্যও কার্পণ্য করে নাই ভারত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও দেশ বিনির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ভারত কুণ্ঠাবোধ করেনি।

দেশটিতে যতবার বিপর্যয় এসেছে ভারত কোনো কিছু না ভেবেই মোকাবিলায় এগিয়ে গেছে বারবার। কিন্তু দীর্ঘদিনের চড়াই উতরাইয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা মাঝে মাঝে ভারতকে হতাশ করলেও ভারত বন্ধুত্বের হাত ছাড়েনি। স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালীন যারা বিরোধিতা করে আসছে প্রতিনিয়িত, তাদের বাড়বাড়ন্ত এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে সম্প্রতি সেই গোষ্ঠি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ভারতের পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে। ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য তাদের সঙ্গে বিএনপিও যোগ দিয়েছে সক্রিয়ভাবে। তারা প্রকাশ্যে ভারতের বিরোধিতা করতে ছাড়ছে না। তারা ভারতের অবদানের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে গলাগলি করতে শুরু করেছে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগ অবশ্য অনেকটাই মিউ মিউ প্রতিবাদ করতে শুরু করলেও ইস্যু মোকাবিলায় সেটা যথেষ্ট নয়।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, আইএসআইকে সন্তুষ্ট করতে রাজাকারের সন্তানরা ভারতবিরোধিতার জিগির তুলতে শুরু করেছে এটি তাদের পুরনো খাসিলত। তিনি আরও বলেন বিএনপি-র রিজভী সাহেবের বাবা ছিলেন পাকিস্তান পুলিশে কর্মরত। পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তিনি। আরেকজন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। যার বাবা চোখা মিয়া নামে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় চোখা মিয়া চোখা রাজাকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেই চোখা রাজাকারের ছেলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা তো অবশ্যই পাকিস্তানের আইএসআইকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভারত বিরোধিতার জিগির তুলবেই। ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে সম্প্রতি বাংলাদেশের উদ্যোগে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

জানা গেছে, ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশ মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির থেকে দীক্ষা নিয়ে বিএনপি সম্প্রতি ভারত বর্জন আন্দোলন শুরু করেছে। বিষয়টি ভালোই ভাবিয়ে তুলেছে এ অঞ্চলের সকলকে। বাংলাদেশের প্রায় সবার ঘরেই ভারতীয় পণ্যের কদর। কেননা ভারতীয় পণ্য সমস্তরকম নিয়মকানুন মেনে চলে এবং গুণমানে উৎকৃষ্ট। একটা কথা এক্ষেত্রে আলোচনার খাতিরেই বলতে হয়, অসুস্থ হয়ে ভারতে এসে চিকিৎসা বর্জনের কথা বিএনপি একবার বলে দেখুক না কতজন তাঁদের কথা শোনে। সেটি না বলে চুলকিয়ে ঘা করার একটা বদ উদ্দেশ্য থাকতে পারার বিষয়টা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিএনপি-র ভারত বিরোধী প্রচার আসলে একদমই অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে।

বিএনপি যা ভাবছে সেটা মালদ্বীপেই সম্ভব। অন্যের নাচ দেখে উঠানে শালিকের ময়ূরের ভান করাটা হিতে হবে বিপরীত এটা বিএনপি জানতে পারবে অনতিবিলম্বে। আর সবই ঘোট পাকিয়ে এমন জট লাগাবে যে ছড়ানোই দায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিএনপি সম্প্রতি তাদের রাজনীতিতে এমন নতুন একাধিক ইস্যু যোগ করার চেষ্টা করছে কোথাও সফলতার মুখ দেখেননি।

ভারতের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি রাস্তাঘাটে এই ঘৃণ্য ইস্যুতে লিফলেট আর ফুল বিতরণ শুরু করেছে। এসব কর্মসূচি অনেকের কাছে কৌতূহল ও কৌতুকেরও বিষয় হয়ে উঠেছে।

এ অঞ্চলের রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, পেঁয়াজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চেয়ে কম দামে সরবরাহ করে কিংবা আরও কমে চাল যদি চীন কিংবা মিয়ানমার থেকে আনা যায় তবে তাই হোক। তাতে কোনোই সমস্যা নেই। তবে বিএনপির এই সাম্প্রতিক আন্দোলনটির মূল উদ্দেশ্য একদম ভালো নয় বলে অনেকে মনে করছেন। এছাড়া ক্রমশই বিষয়টি গভীরে ঢুকে যেতে পারলে ঝুলি থেকে বিড়াল বের হয়ে যেতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

ক'দিন আগে স্থানীয় টিভিতে বিএনপির এক নেতা নিজের একটি শাল পুড়িয়ে প্রচারের আলোয় আসতে চেয়ে বেশি এগুতে পারলেন না। দু' একটা টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান বহু কসরত করে ছবি তুলে তা দেশজুড়ে প্রচারের ব্যবস্থা করলো ঠিকই, তাতে ভারতের বা অন্য কারও কিছুই যে যায় আসেনি তা স্পষ্ট হয়ে গেল। নাটকীয় ঘটনা হয়ে গেল ব্যুমেরাং।

অনেক স্পষ্ট করে বলেছেন ভারতের পণ্য বয়কটে লোকসান হবে বাংলাদেশের। ভারতের পণ্য বর্জন করলে তো চীন-রাশিয়ার পণ্যও বর্জন করতে হবে। বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় পাকিস্তান' বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে অনেক আগে থেকেই। ভারত বয়কটের রাজনীতি খুবই নোংরা এবং দেশবিরোধী। দেশে জেহাদি উন্মাদনা তৈরি করতে চায়

বিএনপি-জামায়াত-সহ কট্টরবাদীগোষ্ঠী। দেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে দাবি উঠেছে, তা বিএনপি জামায়েতের ভারতবিরোধী বিশেষ আন্দোলনের ফসল। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জেহাদি উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমন মন্তব্য করেছেন লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। তাঁর মতে, বিএনপি-জামায়াত মূলত বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র  করে চলেছে দেশ স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই। পাকিস্তান হলো তাদের দোসর। সম্প্রতি ভারতীয় পণ্য বর্জন নিয়ে দেশের রাজনীতিতে যে কথা চালাচালি চলছে, তার নানান দিক ও প্রসঙ্গ নিয়ে জাগো নিউজের কাছে এই মতামত ব্যক্ত করেন শাহরিয়ার কবির। তিনি বলেন, 'ভারত বয়কট রাজনীতি নতুন প্রজন্মের কাছে একটা ঘটনা মনে হতেই পারে। কিন্তু আমরা ভারত বয়কটের রাজনীতি পাকিস্তান আমল থেকেই দেখে আসছি। ১৯৬৫ সালের দিকে এমন আন্দোলন হয়েছে। যারা এখন ভারত বয়কটের রাজনীতি করছেন তাদের চেনার তো বাকি নেই। তারা মূলত বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা করছে। জামায়াত-বিএনপির অ্যাজেন্ডাই হচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানো। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা না গেলেও 'দ্বিতীয় পাকিস্তান' বানানোর ষড়যন্ত্র চলছেই। আর এর অন্যতম অভিব্যক্তি হচ্ছে ভারত বিরোধিতা 'যারা এখন ভারত বয়কটের রাজনীতি করছেন তাদের চেনার তো বাকি নেই।

তাঁর মতে জরুরি সময়ে পেঁয়াজ, আলু, চাল, ডাল, এমনকী ডিম, কাঁচালঙ্কাও আনতে হয় ভারত থেকে। চীন থেকে আনতে গেলে আমাদের খরচ বেশি হবে। আমেরিকা, ইউরোপ থেকে আলু আনতে গেলে তো দাম পড়বে এক হাজার টাকা কেজি।

এদিকে ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের সাড়ে ৩ শতাংশ বাংলাদেশের সঙ্গে। এই সাড়ে ৩ শতাংশ বাণিজ্য বাংলাদেশের সঙ্গে না করলে ভারতের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। তারা অন্য দেশের সঙ্গে এটি করবে। কারণ, তাদের অর্থনীতির আকার বিশাল। কিন্তু তখন আমাদের দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাবে বলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন আমেরিকা, ইউরোপ থেকে আলু আনতে গেলে তো দাম পড়বে এক হাজার টাকা কেজি। বিএনপি নেতারা এক হাজার টাকা কেজি দামে আলু পেঁয়াজ কিনে খেতে পারবেন। কিন্তু দেশের গরিব মানুষ তো পারবে না। তারা তো না খেয়ে মরবে।'

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী রাজনীতির গুরুত্ব পাচ্ছে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি বলেন, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় ভারত নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে আওয়ামি লিগকে সমর্থন দিয়েছে এবং ভারতের কারণেই আওয়ামি লিগ ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে বলে যুক্তি দেয় বিএনপি জামায়াত। যদি তাই হয়, তবে তো একই যুক্তিতে চীনের পণ্যও বর্জনের দাবি তোলা দরকার। কারণ, চীনও তো নির্বাচনের আওয়ামি লিগকে সমর্থন দিয়েছিল। 'আমেরিকা বিরুদ্ধে ছিল। চীনের রাষ্ট্রদূত বারবার বিবৃতি দিয়েছেন নির্বাচনে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। রাশিয়াও তো নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে সমর্থন দিয়েছে। তাহলে তো রাশিয়ার পণ্যও বর্জন করা দরকার'—এ বিশ্লেষণ দেন তিনি। শাহরিয়ার কবির বলেন, 'মূলত ভারতবিরোধী স্লোগান তুলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। আর সেটি জেহাদি উন্মাদনা। এতে গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা শুরু হবে। পাকিস্তান আমলেও ভারতবিরোধীতার মূল টার্গেটে ছিল হিন্দুরা। 'তোরা হিন্দু, তোরা এদেশে থাকতে পারবি না'— এটিই তো হয়ে আসছে।'

'মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য বয়কটের রাজনীতি কোনো সমাধান হতে পারে না। কেউ এটি পারবে না। আমি না চাইলেও অন্যজন পণ্য আনবে। সরকার তো আর পণ্য আনে না। ব্যবসায়ীরাই আনেন। জরুরি হলে সরকার উদ্যোগ নিয়ে থাকে।'

মালদ্বীপ সরকারের ভারতবিরোধী অবস্থানের প্রসঙ্গ টেনে শাহরিয়ার কবির বলেন, মালদ্বীপ একটি গরিব ও অশিক্ষিত দেশ। মালদ্বীপ তো বাংলাদেশের রোল মডেল হতে পারে না। বিএনপি এখন যা করছে, পাকিস্তান আমলে মুসলিম লিগও তাই করেছে। পাকিস্তানের শাসকদের রাজনীতি ছিল অন্ধ ভারত বিরোধিতা। কট্টরবাদের শিক্ষায় আঘাত দেখতে চায় না বাংলাদেশ। আসলে আমেরিকা বাংলাদেশে একটি পুতুল সরকার বসাতে চেয়েছে। সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েই বিএনপি-কে দিয়ে আবারও নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে ভারতীয় পণ্য বর্জন আন্দোলনের মাধ্যমে। এতে বিরধিতার কারণে মানুষের মধ্যে এক ধরনের জিহাদি উন্মাদনা তৈরি করাই হলো বিএনপি জামায়াতের কাজ। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা তৈরি তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারা বোঝাতে চায় আমরা মুসলমান। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদেশের হিন্দুরা ভারতে চলে যাক। পাকিস্তানি অ্যাজেন্ডাই কোনো না কোনোভাবে বাস্তবায়ন করতে চাইছে বিএনপি-জামায়াত।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, আমরা তো পাকিস্তান আমল দেখেছি। ষাটের দশকে ভারত বয়কটের রাজনীতি ছিল ছ' দফা আন্দোলন প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য। আইয়ুব খানের আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য। আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুতরাং এটি বাংলাদেশের জন্য নতুন জিনিস নয়।

'বিএনপি মহাসচিব (মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর) তো প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বলেছেন— 'পাকিস্তান আমলে আমরা ভালো ছিলাম'। যারা পাকিস্তান আমল দেখেনি তাদের বুঝতে হবে বিএনপি-জামায়াত আসলে কী চাইছে। পাকিস্তানেও এখন এমন ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডা নেই।'

বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলোতে হিন্দি সিনেমা চলে না। কিন্তু পাকিস্তানের ৯০ শতাংশ সিনেমা হলে ভারতের সিনেমা চলে। বিএনপি-জামায়াত মূলত দেশের লাভের জন্য ভারতের বিরোধিতা করছে না, করছে বাংলাদেশের অর্থনীতি অচল করার জন্য। পণ্যের দাম বাড়লে সরকার টালমাটাল হবে। বিরোধীদের তখন সুবিধা হবে'— যোগ করেন তিনি।

'তরুণরা না বুঝে এ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। বিএনপি- জামায়াতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যদি ভারতীয় পণ্য আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কে লাভবান হবে? ভারতের এখানে কিছুই যায় আসে না। লোকসান হবে আমাদের, বাংলাদেশের।

পাকিস্তান ভেঙে যে বাংলাদেশের জন্ম, সেই বাংলাদেশ থাকবে তলাবিহীন ঝুড়ি হয়ে, বিএনপির প্রত্যাশার বাংলাদেশ সেটাই। এখন সেই বাংলাদেশে যদি রাজধানীর দিগন্ত জুড়ে ছোটাছুটি করে মেট্রোরেল আর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির বহর, তবে সেই বাংলাদেশ তো তাদের গাত্রদাহের কারণ হবেই। কাজেই তারা আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের সহযাত্রী ভারতের পণ্য বর্জন চাইবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। □

# বন্ড রাজনীতির নেপথ্যে বিরোধীদের অন্য খেলা রয়েছে

**তথ্য জানার অধিকার আইন লঙ্ঘনের কারণে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বন্ড ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিলেও বিচারপতিরা রায়ে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেননি। একথা অনস্বীকার্য নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব রুখতে বিকল্প একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য ইলেক্টোরাল বন্ড বাতিল না করে তার সংশোধন জরুরি।**

**আনন্দ মোহন দাস**

সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসার পর কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি তা নিয়ে তথ্য প্রমাণ ছাড়াই যেভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, তাতে অনেকেই রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। কংগ্রেস আগে থেকেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে গৌতম আদানির মতো শিল্পপতির ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তুলে জনমানসে একটি ভুল ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করে গিয়েছে যে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে তাদের সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এর স্বপক্ষে কোনোরকম তথ্য প্রমাণ পেশ করা হয়নি। নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসার পর কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি এ বিষয়ে আরও বেশি শোরগোল তুলেছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বিরোধী দলগুলি বিভিন্ন ন্যারেটিভ তৈরি করে মোদীকে বিপাকে ফেলার অপপ্রয়াস করে চলেছে। কারণ বর্তমান শাসক দলের দশ বছর শাসনকালে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি বা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধীদের জুতসই কোনো ইস্যু না থাকায় নির্বাচনী ময়দানে আঘাত হানতে মরিয়া প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাদের একসূত্রী কর্মসূচি হলো মোদীকে হঠিয়ে লুটেপুটে খাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করা। বিরোধী ইন্ডি জোটে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কোনো নেতা নেই এবং তাদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচিও নেই। পরস্পর বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী কয়েকটি দুর্নীতিগ্রস্ত দলের জোট ছাড়া কিছু নয়। সেজন্য লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করে মোদীকে হঠানোর গণতান্ত্রিক প্রয়াস না করে, বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিযোগ করে মোদীকে অপদস্থ করা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিরোধীদের আপাতদমস্তক দুর্নীতির কার্যাবলী থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘোরানো। বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অপদস্থ করাই হলো মূল লক্ষ্য। কারণ মোদী সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বিরোধীদের বিপাকে ফেলেছে। বিরোধীরা ভালো করেই জানেন, আগামী পাঁচবছরের জন্য মোদী আবার শাসন ক্ষমতায় ফিরলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের হাজতবাস নিশ্চিত এবং দেশকে লুঠ করে পারিবারিক সম্পত্তি বৃদ্ধির সহজ রাস্তা একেবারেই বন্ধ হবে। তাই বিদেশি শক্তির মদতে আগামী নির্বাচনের আগে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তুলে শোরগোল তোলাই এদের একমাত্র কাজ। এই রকমই একটি বিষয় হলো ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে বিরোধীদের রাজনীতি। সেজন্য ইলেক্টোরাল বন্ডের আসল তথ্যটি জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে।

বলাবাহুল্য, নির্বাচনে লড়াই করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এর মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। সেজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই কর্পোরেট ও অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে নির্বাচনী চাঁদা নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকেই এই ধরনের রীতি চলে আসছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে দল যখন ক্ষমতাসীন থাকে তারাই প্রধানত চাঁদা বেশি পেয়ে থাকে। কিন্তু ২০১৮ সালের আগে রাজনৈতিক দলগুলি বেশিরভাগ চাঁদা নগদে আদায় করতো এবং তার ফলে নির্বাচনে কালো টাকার বা হিসাব বহির্ভূত টাকার রমরমা ছিল। এই কালোটাকার প্রকোপে অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব পড়তো এবং এই টাকার উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে নির্বাচনী বন্ডে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। দেখা গেছে ক্ষমতাসীন দলগুলি নগদ চাঁদার বিনিময়ে কর্পোরেট ও অন্যান্য সংস্থাগুলির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ অনায়াসে করতো যা সহজে প্রকাশ্যে আসতো না। এটাই ছিল দুর্নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার ফলে কংগ্রেস বা ইউপিএ-র আমলে বিশাল দুর্নীতি যথা টুজি স্পেকট্রাম, কয়লা, বফর্স, কমনওয়েলথ গেমস ও সাবমেরিন কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নীরবে ঘটে থাকতো। নির্বাচনে নগদে চাঁদা আদায়ের বিষয়টির মধ্যে স্বচ্ছতা ছিল না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি ১০০০ টাকা নগদে চাঁদা আদায় করলে, সংগ্রাহক ব্যক্তি ১০০ টাকা দলকে দিয়ে ৯০০ টাকা পকেটস্থ করতো। তার ফলে নির্বাচনের নামে বেহিসাবি কালো টাকার প্রভাব এবং স্বচ্ছতার অভাব থাকতো। স্বাধীনতার পর থেকে সমস্ত সরকারের এই বিষয়টি গোচরে থাকলেও নিজ স্বার্থে কেউ কখনও বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। কিন্তু ২০১৭ সালে নরেন্দ্র মোদীর আমলে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রথম নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব হ্রাস করতে এবং রাজনৈতিক দলগুলির চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে

স্বচ্ছতা আনতে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকসভায় ২০১৭-১৮ বাজেটে অর্থ বিল পেশের মাধ্যমে ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে এসেছিলেন। ইলেক্টোরাল বন্ড আরবিআই নির্ধারিত কোনো ব্যাংক (স্টেট ব্যাংক) থেকে ১০০০, ১০০০০, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ বা ১ কোটি টাকার ডিনোমিনেশনে কেনা যায় এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। তার ফলে কর্পোরেট সংস্থা বা কোনো ব্যক্তি যে কোনো পরিমাণ ইলেক্টোরাল বন্ড কিনতে পারে এবং পছন্দ মতো যে কোনো স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে চাঁদা হিসেবে বন্ড প্রদান করতে পারে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল Indian People representation Act, 1951 (U/S 29A) অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে কমপক্ষে ১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তারাই ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সংগৃহীত বন্ডগুলি ভাঙিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়, অন্যথায় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে জমা হয়ে যায়।

এই প্রক্রিয়ায় দাতার নামের গোপনীয়তা বজায় থাকে এবং দলগুলির কাছ থেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সুযোগ থাকে না। স্বাধীনোত্তরকালে এটি একটি অন্যতম নির্বাচনী সংস্কার বলে মনে করা হয়। সেই সময় লোকসভায় কংগ্রেস-সহ অধিকাংশ বিরোধী দল এই বিলটিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ কংগ্রেস-সহ বেশিরভাগ বিরোধী দল ক্ষুদ্র স্বার্থে এই বন্ডের বিরোধিতা করে জনমানসে বিজেপি বিরোধী মিথ্যা ন্যারেটিভ গড়ে তুলেছে। ২০১৮ সাল থেকে ইলেক্টোরাল বন্ড চালু করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। (১) নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব হ্রাস করা, (২) দাতার পরিচয়ের গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং (৩) নির্বাচনী চাঁদা পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা।

দেখা গেছে গোপনীয়তা বজায় না থাকলে অন্য দলের বিরাগভাজন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেজন্য ইলেক্টোরাল বন্ডের উদ্দেশ্য ছিল গোপনীয়তা বজায় রাখা। এই বন্ডের মাধ্যমে নির্বাচনী চাঁদা সংগ্রহ হলে দাতা ও গ্রহীতার উভয়েরই অ্যাকাউন্টে স্বচ্ছতা থাকে এবং নিজেদের ব্যালেন্স শিটে তার উল্লেখ থাকে। সুতরাং স্বচ্ছতার দিক থেকে এবং কালো টাকা হ্রাস করার ক্ষেত্রে ইলেক্টোরাল বন্ড অনেক বেশি কার্যকরী বলে ভাবা হয়েছিল যা নগদে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট Association for Democratic reforms নামে একটি সংস্থা যারা সুপ্রিম কোর্টে ইলেক্টোরাল বন্ডের দাতা ও গ্রহীতার নাম প্রকাশের জন্য জনস্বার্থ মামলা করে এবং অভিযোগ করে ইলেক্টোরাল বন্ড RTI দায়রার বাইরে, যার ফলে এটির মধ্যে স্বচ্ছতা নেই। এই মামলার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে দীর্ঘ শুনানির পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে এই বন্ডকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে। কারণ এটি তথ্য জানার অধিকার আইনকে লঙ্ঘন করেছে। সেজন্য উচ্চ আদালত স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে সমস্ত ইলেক্টোরাল বন্ডের বিশদ বিবরণ নির্বাচন কমিশনে জমা করার আদেশ দেয়। নির্দেশমতো নির্বাচন কমিশন সেগুলো তাদের পোর্টালে আপলোড করে। তারপরই ইন্ডি জোটের কংগ্রেস-সহ অধিকাংশ দল বিজেপির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শোরগোল তুলে জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে।

নির্বাচনী চাঁদা নেওয়ার জন্য ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে বিরোধীদের রাজনীতি দেখে মনে হচ্ছে যেন ৭৫ বছরে এই প্রথমবার রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী চাঁদা আদায় করছে এবং বিজেপিই যেন এর থেকে একমাত্র লাভবান। কিন্তু বিরোধীরা তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করে চলেছে। কিন্তু বাস্তব স্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এর পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যেনতেন প্রকারে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বদনাম করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ফায়দা হাসিল করা।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসবিআই-এর দেওয়া ইলেক্টোরাল বন্ডের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, মোটা চাঁদা বাবদ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা রাজনৈতিক দলগুলি চাঁদা পেয়েছে। তার মধ্যে বিজেপি ৬০০০ কোটি টাকা পেয়েছে এবং বাকি ১৪০০০ কোটি টাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দল পেয়েছে। অন্যান্য দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ১ হাজার ৪২২ কোটি টাকা, আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১৬১০ কোটি টাকা এবং তেলেঙ্গানার বিআরএস পেয়েছে ১ হাজার ২১৫ কোটি টাকা। বাকি টাকা অন্যান্য দল পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির ৩০৩ জন সাংসদ ও ১৯টি রাজ্যে ক্ষমতা থাকার সুবাদে সর্বাধিক ৬০০০ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি লোকসভার ৫৫ শতাংশ সাংসদ নিয়ে মোট চাঁদার ৩০ শতাংশ পেয়েছে। অথচ তৃণমূল দল মাত্র ৪ শতাংশ সাংসদ নিয়ে দ্বিগুণ ৮ শতাংশ চাঁদা পেয়েছে। কংগ্রেস ৯ শতাংশ সাংসদ নিয়ে সাত শতাংশ চাঁদা পেয়েছে।

তাহলে এতগুলো রাজ্য ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপির তো তুলনামূলক আরও বেশি চাঁদা পাওয়ার কথা কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যায় তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সাংসদ নিয়ে বিরোধী দলগুলি বেশি পরিমাণ চাঁদা পেয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ফিউচার গেমিং সংস্থা তৃণমূল দলকে চাঁদা দিয়েছে ৫৪২ কোটি টাকা, অথচ সেক্ষেত্রে বিজেপিকে দিয়েছে মাত্র ১০০ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের যুক্তি কী? অবশ্যই উল্লেখ্য, ইলেক্টোরাল বন্ড যদি দুর্নীতির আখড়া হয়, সেই পাঁকে বিরোধীরাও নিমজ্জিত। কারণ এই বন্ডের মাধ্যমে তারাও চাঁদা সংগ্রহ করে এর সুযোগ নিয়েছে। অথচ বন্ডের মাধ্যমে চাঁদা নিয়ে বিরোধীরা অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপির দিকে। বিরোধী দলগুলিও বন্ডের মাধ্যমে টাকা পেয়েছে। বন্ডের মাধ্যমে টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধীদের আপত্তি থাকলে তাদের তা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা কী?

কংগ্রেসের অভিযোগ হলো ইডি, সিবিআই ও ইনকাম ট্যাক্স তদন্তের পর বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা বিজেপিকে বন্ডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চাঁদা দিয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার পরই ৯০ শতাংশ চাঁদা বিজেপি পেয়েছে। বিরোধীরা আর একটি অভিযোগ করেছে নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থাকে 'quid pro quo' আখ্যা দিয়ে অর্থাৎ কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং যদিও এরকম কিছু হয়ে থাকলে বিরোধীরাও সেই দোষে দুষ্ট। কারণ তারাও বন্ডের সুযোগ নিয়েছে। তবে এই নিয়ে দুর্নীতির কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তথ্য জানার অধিকার আইন লঙ্ঘনের কারণে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বন্ড ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিলেও বিচারপতিরা রায়ে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেননি। একথা অনস্বীকার্য নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব রুখতে বিকল্প একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য ইলেক্টোরাল বন্ড বাতিল না করে তার সংশোধন জরুরি রয়েছে।

# ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড জলপাইগুড়ি, সেবাকাজে শাসকদলের বাধা

**সংবাদদাতা॥** গত ৩১ মার্চ, রবিবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ মাত্র ১০-২০ মিনিট স্থায়ী ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড জলপাইগুড়ি। আচমকা বিধ্বংসী ঝড়ে গাছের ডাল চাপা পড়ে পৃথক জায়গায় মৃত্যু হলো সাত জনের। এর মধ্যে চার জনের পরিচয় জানা গিয়েছে। মৃতরা হলেন সমর রায় (৬৪), যোগেন রায় (৭০), অনিমা রায় (৪৯) ও দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ সরকার (৫২)। এছাড়াও প্রায় শতাধিক মানুষের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। প্রায় ১৫০০ পরিবার গৃহহীন। ঝড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়া, গোশালা এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ, পুটিমারী, ধর্মপুর এলাকা। এই দিন দুপুরে আচমকাই প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয় তিস্তা নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অংশে। ওই সময় জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ার কাছে একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়লে তার নীচে চাপা পড়েন এক ব্যক্তি। বছর পঞ্চান্নর অজ্ঞাত পরিচয় এই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দমকল। চিকিৎসকরা জানান, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ময়নাগুড়ি ব্লকে ঝড়ের সময় এক ব্যক্তি মাঠে গোরু আনতে গেলে একটি গাছ ভেঙে তাঁর ওপর পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গাছ পড়ে যাওয়ার দরুন যাতায়াত ও পরিবহণ সম্পূর্ণ ভাবে হয় বিপর্যস্ত। ঝড়ের ফলে ভেঙে পড়ে ইলেকট্রিক পোল ও বৈদ্যুতিন ট্রান্সফর্মার। ক্ষণস্থায়ী এই ঝড়ে বহু মানুষের বাড়িঘর সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছে। আহতদের ভিড়ে লোকারণ্য হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল। এদিনের ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে পিক আপ ভ্যান, টোটো, মোটর সাইকেল-সহ বেশ কিছু যানবাহনেরও ক্ষতি হয়েছে। ঝড় শুরু হতেই প্রাণ হাতে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে দেখা যায় পথচলতি মানুষ ও গাড়িচালকদের। গোশালা মোড় থেকে রংধামালি যাওয়ার রাস্তাটি এদিন গাছ পড়ে আটকে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে গাছ সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। গোশালা মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে একাধিক ধাবা ও হোটেলের টিনের চাল উড়ে যায় এদিনের ঝড়ে। ঘটনায় আহতদের মধ্যে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন ৬০ জন। এছাড়াও অনেক আহত ভর্তি হন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতির পরিমাণ জানার চেষ্টা চলছে। এইদিনই হঠাৎ প্রবল ঝড়ে লন্ডভন্ড হয় আলিপুরদুয়ারের একাধিক এলাকা। এইদিন বিকেল বেলায় আলিপুরদুয়ার জেলার কামসিং ঘরঘড়িয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ের কারণে একাধিক বাড়ি-ঘর ভেঙে যায়। ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘরছাড়া বহু মানুষ।

ঝড়ের পরেই ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ অঞ্চলে ত্রাণ ও সেবা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ চলে। স্বয়ংসেবকরা ঘূর্ণিঝড় পীড়িতদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সেবা কাজ চলতে থাকে। ঝড়ে আক্রান্তদের দুধ, বিস্কুট, মুড়ি, গুড় দেওয়া হয়েছিল। গত ১ এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে স্থানীয় স্বয়ংসেবক ডাক্তারবাবু আক্রান্ত ও আহতদের চিকিৎসা করেন। অন্য স্বয়ংসেবকরা পড়ে যাওয়া গাছ পরিষ্কার, গাছ ও বাড়িগুলির নীচে চাপা পড়ে থাকা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরানোর কাজে হাত লাগান।

ওইদিনই আক্রান্তদের পাউরুটি, কলা, দুধ, বিস্কুট, জল ও ত্রিপল সরবরাহ করা হয়। রাতেও খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। ২ এপ্রিল সকালেও আক্রান্তদের জন্য দুধ, কলা, পাউরুটি, বিস্কুট এবং দুপুরে ও রাতে খিচুড়ির ব্যবস্থা করে স্বয়ংসেবকরা। কিন্তু শাসকদলের কিছু দুষ্কৃতী এসে স্বয়ংসেবকদের সেবা কাজ বন্ধ করার হুমকি দেয়। যে বাড়ির বারান্দায় আক্রান্তদের সেবাকাজ চলছিল, তাদের ওপরেও প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়, এমনকী ভীতি প্রদর্শনও করা হয়। ঘূর্ণিঝড় পীড়িতদের পাশে দাঁড়ানো থেকে স্বয়ংসেবকদের বলপূর্বক বিরত করার ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসকদলের এই প্রয়াস ঘৃণ্য ও অতীব নিন্দনীয়। এলাকার মানুষদের তাদের নিন্দায় সোচ্চার হতে দেখা যায়। □

# জ্ঞানবাপীতে হিন্দুদের পূজা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরে গত ১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টেও ধাক্কা খেলো জ্ঞানবাপী মসজিদ কমিটি। হিন্দুদের পুজো-আরতি বন্ধ করতে অস্বীকার করল শীর্ষ আদালত। মসজিদের তহখানায় হিন্দু পক্ষের ধর্মীয় অধিকার আছে বলে জানিয়ে হিন্দু পক্ষের পূজা-আরতি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। তবে মুসলমানরা জ্ঞানবাপীতে নমাজের আয়োজন করতে পারবে।

জ্ঞানবাপীর তহখানায় পূজার অনুমতি নিয়ে বারাণসী জেলা আদালতের রায়দানের পর এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মুসলিম পক্ষ। সেখানেও হিন্দুদের পুজো চলবে বলে জানিয়েছিল হাইকোর্ট। এরপর সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি। এবার তাদের পুজো বন্ধের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্ডিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ।

উল্লেখ্য, জ্ঞানবাপীতে মোট চারটি তহখানা রয়েছে। যেখানে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত পূজা, প্রার্থনা চলতো। সেখানে জ্ঞানবাপীর দক্ষিণ দিকের তহখানায় নতুন করে পুজো শুরু হয়েছে। সেই পুজোর ক্ষেত্রে কোনো স্থগিতাদেশ না দিয়ে গত ১ এপ্রিল বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, চলটি বছরে ১৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি আদালতের নির্দেশের পরে মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে নমাজ পড়ছে। অন্যদিকে হিন্দুদের পূজার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে। উভয়ে শর্ত মেনে উপাসনা করতে পারবে। আদালত জানিয়েছে, তহখানায় পূজার অনুমতির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আগামী জুলাই মাসে। এর আগে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) রিপোর্টে বলা হয়েছে মসজিদের ওজু খানায় শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে শ্রীহনুমান, বিষ্ণু, নন্দীর মূর্তিও থাকার কথা জানা গিয়েছে রিপোর্টে। রয়েছে দেবদেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্য। অর্থাৎ, বিভিন্ন দেবদেবীর সন্ধান পাওয়ায় সেখানে হিন্দু পক্ষকে পূজার অনুমতি দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

২০২১-এর আগস্টে পাঁচ জন হিন্দু মহিলা জ্ঞানবাপীতে মা শৃঙ্গার গৌরী এবং তথাকথিত মসজিদের অন্দরের পশ্চিমের দেওয়ালে দেব-দেবীর মূর্তির অস্তিত্ব রয়েছে দাবি করে তাদের পূজার অনুমতি চেয়েছিলেন বারাণসী আদালতে। সেই মামলায় বারাণসী দায়রা আদালতের বিচারক রবি কুমার দিবাকর নিযুক্ত কমিটির নির্দেশে জ্ঞানবাপীর ভিতরে শুরু হয় ভিডিয়োগ্রাফি। পরে আদালতে জমা পড়ে এএসআই রিপোর্টও।

## তাইওয়ানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৪

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত ৩ এপ্রিল ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তাইওয়ান। কেঁপে ওঠে ব্রিজ থেকে রাস্তা ও পথচলতি যানবাহন। ভেঙে পড়ে একাধিক বহুতল। হেলে পড়ে অসংখ্য বাড়ি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৪। রাজধানী তাইপে ও সংলগ্ন এলাকায় বহু বাড়ি ও রাস্তায় ফাটল দেখা দেয়। ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া ঘর-বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু মানুষ আটকে পড়েন।

এই ভূমিকম্পের আঘাতে অগণিত মানুষ আহত ও মৃত। ব্রিজ ও বহুতলগুলির নড়তে থাকা, বাড়িগুলি ভেঙে পড়ার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। শিউরে ওঠার মতো সেই ভিডিয়োগুলিতে উঠে আসে ভূকম্পজনিত ধ্বংসের চিত্র। এই ভূমিকম্পের পরেই জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জারি হয় সুনামি সতর্কতা।